লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ১৮ ও ১৯ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ২১ শাবান, ১৪৪১ হিজরি | ১৫ শাহাদাত, ১৩৯৯ হি. শা. | ১৫ এপ্রিল, ২০২০ ঈসাব্দ

Mahdi Mosque in Strasbourg, France

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর বিশেষ নির্দেশনা:

১. সরকার প্রণীত নিয়ম-নীতি মেনে চলুন
২. বয়স্করা নিজেদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখুন।
৩. বয়স্কদের বাসা-বাড়ী থেকে বের না হওয়াই ভাল।
৪. জুমুআর নামায নিজেদের মসজিদেই আদায় করুন। জুমুআর নামায আদায়ের জন্য অনেক দূরে কোথাও যাতায়াত করার দরকার নেই।
৫. মহিলারা এ ক'দিন মসজিদে যাবেন না বাড়িতেই থাকুন।
৬. ছোট-বড় সকলেই পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন এবং রাতে ভালমত ঘুমান।
৭. বাইরের খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, বিশেষ করে প্রিজারভেটিভ দেয়া সামগ্রী পরিহার করুন, যেমন: চিপ্‌স।
৮. সারাদিন অনেক বেশি করে পানি পান করুন।
৯. হাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। হ্যান্ড স্যানিটাইজার না পেলে সাবান দিয়ে হাত ভালভাবে ধৌত করুন।
১০. অযু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম। নিয়মিত ওযু করুন।
১১. মুখ রুমাল বা টিস্যু দিয়ে ঢেকে হাঁচি দিন।
১২. ব্যক্তিগত ও পরিবেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
১৩. সকল অসুস্থ লোকের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন পৃথিবীর সকলকে রক্ষা করেন। আল্লাহ্ তা'লাই আমাদের রক্ষক।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে আমাদের যা করতে হবে–

ঘন ঘন সাবান বা সেনিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে (২০ সেকেন্ড)।

হাঁচি বা কাশি দেয়ার সময় রুমাল বা টিস্যু ব্যবহার করতে হবে।

টিস্যু ব্যবহারের পরই তা বিনে ফেলে দিতে হবে।

অসুস্থতা অনুভব করলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন এবং পরামর্শ নিন।

করোনার লক্ষণে দ্রুত সরকারী হটলাইনে যোগাযোগ করুন: ১৬২৬৩, ৩৩৩, ০১৯৩৭-১১০০১১, ০১৯২-৭৭১১৭৮৪

জনসমাগম এড়িয়ে চলুন। নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখুন।

করমর্দন ও কোলাকুলি থেকে ক'দিন বিরত থাকুন।

হাত জীবানুমুক্ত না করে হাত দিয়ে নাক, মুখ ও চোখ স্পর্শ করবেন না।

পথে -ঘাটে সেখানে সেখানে থুথু বা কফ ফেলবেন না। এটি স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করুন।

সবাই সচেতন ও নিরাপদ থাকুন!

COVID-19

রিশতানাতা বিষয়ক সম্মেলন ও আলোচনা সভা

গত ২০ মার্চ ২০২০ রোজ শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রিশতানাতা বিভাগের উদ্যোগে রিশতানাতা বিষয়ক সম্মেলন ও আলোচনা সভা মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন, মওলানা শেখ মুস্তাফিজুর রহমান ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। পরিশেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাদের রিশতানাতা বিষয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিন। উক্ত অনুষ্ঠানটি এমটিএ বাংলাদেশের মাধ্যমে ইউটিউব ও ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

সম্পাদকীয়

কোনও মানুষই নিজে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়

'দ্বীপ-বাস' মানবিক এক কল্পনা-বিলাস। সম্ভাব্য কারণটি হল, এর নির্জনতা মানব হৃদয়কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের মায়াবী এক আকর্ষণে কাছে টানে। এমন জীবনধারায় মানুষ যেন নগরজীবনের বাঁধা-ধরা নিয়মের বাইরে আরব্য রজনী উপন্যাস বা গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী'র দ্বীপগুলির অনন্য বৈচিত্রের মত আনন্দ-সুখ পেতে চায়।

সম্ভবত আমরাও আমাদের জীবনকে একটি দ্বীপে জীবনযাপনের মতই বানিয়ে ফেলেছি; আমাদের নিয়ম-কানুন, আমাদের উপায়-উপকরণ মাঝে মধ্যেই আমাদেরকে তেমনটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

তবে, সময় এবং প্রযুক্তি সেই নিয়মগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে পুরনো ধ্যাণধারণা বদলে দিয়েছে। কোন স্থান কতটা দূরে বা কতটা দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত, তা আজ আমরা সহজেই নির্ণয় করতে পারি। আমরা আফগানিস্তানের নিষিদ্ধ রাজপথ থেকে খাবার কিনে স্বাদ নিতে পারি আবার সুদূর মঙ্গোলিয়ার কোন বাজার থেকে বর্ণাঢ্য পোশাক ক্রয় করেও পরতে পারি।

অতীতে, আমরা সমুদ্রের ওপারের ছোট-বড় এবং আমাদের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন দেশগুলোর সমস্যাদি উপেক্ষা করতে পারতাম। হ্যাঁ, আমরা ধনী হয়েছি বিরল ধাতু, তেল এবং মাছ আহরণ করে, তবে এই কাজ করতে গিয়ে আমরা পরিবেশের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। লোকেরা অন্যান্য জাতির সমস্যা ও রোগ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত বলে ধারণা করেছিল। আফ্রিকার 'ইবোলা', ও'-তো অনেক দূর; তাতে আমাদের চিন্তার কি আছে? কিন্তু এখন, হায়! হাহুতাশ ছাড়া আর কিছু করার নেই।

আবার ধরুন একাকার হয়ে যাওয়ায় অঞ্চল ভিত্তিক অর্থনৈতিক জোট তৈরি হবার কারণে জোটগুলোর মাঝে অসুস্থ্য প্রতিযোগিতার কারণে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে যেমন, আসিয়ান গ্রুপ, ইউরোপিয়ান অর্থনৈতিক গ্রুপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখনও দূরদেশের কোন জাতি যখন অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে, তখনও অস্থিরতার ঢেউ পশ্চিমা বিশ্বের উন্নয়নের ভিত যত মজবুতই হোক তা ঐ ভিতের বালুকণা সরিয়ে নড়বড়ে করেই দেয়। সন্ত্রাস, হিংস্রতা, মানবাধিকার পদদলিতকরণ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সবই আমাদের মহাবিশ্বের জীবনকে প্রভাবিত করেই ছাড়ে যদিও আমাদের অনেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসাবে কল্পনা করতেই ভালবাসে।

আজকাল উন্নত বিশ্বের দোরগোড়ায় এমন সমস্যা ও রোগ-বালাই'এর সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে, যে রোগগুলো সম্পর্কে আগে ভাবা হতো ও'সব রোগ কেবল সেসব দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে যাদের সম্পদের উন্নত সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত বিশ্ব গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ আহরণে ধংস করা হয়েছে বনাঞ্চল, হয়েছে পানি-দূষণ। অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করা হয়েছে 'ভূ-সংস্থান'এর।

এই যে উন্নয়ন, এর বিপরীতমূখী ক্ষতিকর দিকও আছে।

আর তা হল, বিশ্বের নিরপরাধ লোকেরা অন্যদের অনাসৃষ্টির অনিষ্টের লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ কভিড-১৯; অতিশয় ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম একটি ভাইরাস। তবে এই শত্রু এতটাই মারাত্মক যে, গোটা বিশ্বকেই নতজানু করে দিয়েছে। একে প্রতিরোধ করার লড়াইয়ে আজ বিশ্বজুড়ে জাতিসমূহ বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে চলছে।

আমরা কেবলমাত্র লোকক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক মন্দা প্রত্যক্ষ করছি, এ সবই উপরি কাঠামোর বিষয়। মানুষ অস্বাভাবিক বা অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। সামাজিক দূরত্বের কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, আর্থিক আয়-উপার্জনের পথ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ায় এবং ব্যক্তিগত আয় কমে যাওয়ায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বেড়ে গেছে। ফলে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোসহ সব দেশেই অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিচ্ছে বরং পুরো অর্থনেতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

আমরা যদি গত দুই দশক, এক নজরে বিশ্লেষণ করি তবে আমরা দেখতে পাই ব্যতিক্রমী পুনর্বিন্যাস করণের সাথে এক নব বিপর্যয়ের উত্থান ঘটে আর বিশ্বব্যাপী প্রতিটি অসুস্থতা নিয়ন্ত্রনের বাইরে গিয়ে, আগের চেয়ে আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

এবারে একটি সুসংবাদ হল এই দূর্যোগ থেকে বের হয়ে আসার উপায় ইসলামে আছে। আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত থাকাই ইসলামের মূলনীতি।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, বিনত থাকার অর্থ কী? এর অর্থ হল, ঐশী শিক্ষামালা অনুধাবন করে তদনুযায়ী আমাদের জীবন-যাপন করা। এবং এছাড়া আল্লাহ্‌র বাণীতে সঠিক পথনির্দেশনার গভীরতা অনুধাবন করা উচিত। অর্থাৎ সেই পবিত্র কুরআন যা মৌখিকভাবে পাঠ করা সহজ কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধান করে তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা মসৃণ নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বিধৃত শিক্ষামালায় রয়েছে- "বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না" (আল্ আ'রাফ: ৫৭; আল্ বাকারা: ২০৬) এবং "শত্রুদের সাথেও নিখুঁত 'ন্যায়বিচার' সহকারে বিচার-কার্য সম্পন্ন কর" (আল্ মায়েদা: ৯)। বিশ্ব যদি এই নীতিমালা মেনে চলে, তবে ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশ্বের ভবিষ্যত সুরক্ষা পেতে পারে; অন্যথায় কোন না কোন ভাবে, ধ্বংস-চক্রের ঘূর্ণন অব্যাহত থাকবে, সাথে বয়ে আনবে অবর্ণনীয় দুঃসহ দুঃখ-বেদনা ও বিপর্যয়।

সর্বদা মানুষকে কোন না কোন পথ অনুসরণ করতেই হয়। সৎকর্ম ও দানশীলতার পথ 'জীবন' বয়ে আনে; লোভ-লালসা আর গ্রাসের সর্বভুকতা আনে মৃত্যু।

বুদ্ধিমান মানুষ এবারে কোন পথটি বেছে নেবে?

সূচিপত্র

৩১ মার্চ ও ১৫ এপ্রিল ২০২০

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ মে ২০১৯ মোতাবেক ০৩ হিজরত ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা** **মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ** ৯

চিকিৎসার কার্যকারিতা আল্লাহ্ তা'লার কৃপানির্ভর ১৮
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

খেলাফতের কল্যাণ ২৩
শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

বিশ্বনবী (সা.)-এর মেরাজ ও দর্শন ২৭
মাহমুদ আহমদ সুমন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কলকাতার অতিথিপরায়ণতা এবং কিছু অভিজ্ঞতা ২৯
খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম

সংবাদ ৩২

শোক সংবাদ ৩৬

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٨﴾

৮৮। সে বললো, 'যে-ই যুলুম করেছে আমরা অবশ্যই তাকে আযাব দিব। এরপর তাকে (যখন) তার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে[১৭২২] তখন তিনি তাকে আরো কঠিন আযাব দিবেন।

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٩﴾

৮৯। আর যে ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর আমরা নিজ আদেশে তার (বিষয়াবলী) সহজ করার সিদ্ধান্ত দিব[১৭২৩]।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٠﴾

৯০। এরপর সে (অন্য) এক পথে চলতে লাগলো।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩١﴾

৯১। অবশেষে সে যখন সূর্যোদয়স্থলে[১৭২৪] পৌঁছলো তখন সে এ (সূর্যকে) এমন এক জাতির উপর উদয় হতে দেখলো, যাদের (এবং) এ (সূর্যের) মাঝে আমরা কোন আড়াল সৃষ্টি করি নি।

كَذٰلِكَ ۬ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩٢﴾

৯২। এভাবেই হল। আর অবশ্যই আমরা তার সব বিষয়ই পুরোপুরি অবহিত।

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٣﴾

৯৩। এরপর সে (অন্য আর) এক পথে চলতে[১৭২৫] লাগলো।

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٤﴾

৯৪। অবশেষে সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে[১৭২৬] পৌঁছলো তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে দেখতে পেল, যারা (তার) কথা বুঝতে পারছিল না[১৭২৭]।

১৭২২। সাইরাস পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করতেন। তিনি যরাথুস্ত্র নবীর অনুসারী ছিলেন এবং ইসলামপূর্ব সকল ধর্মের মধ্যে যরাথুস্ত্রের ধর্মবিশ্বাসই মৃত্যুর পরের জীবনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, সাইরাস এবং তাঁর পার্সী অনুসারীরা যরাথুস্ত্র নবীর মতবাদে আস্থাবান ছিলেন এবং বিদেশী ধর্মবিশ্বাস বা পূজা পদ্ধতিকে খুব ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন (যিউ এনসাইক, ৪র্থ খণ্ড, ৪০৪ পৃষ্ঠা)।

১৭২৩। দেখুন যিশাইয়-৪৫:১৩ এবং ২-বংশাবলী ৩৬:২২-২৩।

১৭২৪। এই আয়াত সাইরাসের পূর্ব দিকে আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তানের দিকে অভিযানের প্রতিই ইশারা করছে। এই এলাকা বৃক্ষহীন অনুবর্র। এখানে সূর্যের তাপ প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। এটি এরূপ জনগোষ্ঠির প্রতিও প্রয়োগ হতে পারে যারা সমতল প্রান্তরের অধিবাসী ছিল, যা শত শত মাইল ব্যাপী সিস্তান এবং হিরাতের পূর্ব দিকে এবং দুজদবের উত্তরে মেশেদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৭২৫। এই আয়াত সাইরাসের তৃতীয় অভিযানের প্রতি নির্দেশ করছে, যা পারস্য দেশের উত্তরে কাসপিয়ান সাগর এবং ককেশীয় পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা রাজ্যের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

১৭২৬। দুই পাহাড় দ্বারা দুই প্রতিবন্ধকতা বুঝাতে পারে। যেখানে দেয়াল নির্মিত হয়েছিল তার একদিকে কাসপিয়ান সাগর অপরদিকে ককেশাস পর্বতমালা। এই দু'টি প্রতিবন্ধকরূপে বিরাজমান ছিল।

১৭২৭। এ সব অঞ্চলের লোকেরা সাইরাসের ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু পারস্যের নিকটবর্তী প্রতিবেশী হওয়ায় এবং পারস্য ও মেদীয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তারা তাদের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারত, যদিও যথেষ্ট অসুবিধা ও ভুল ভ্রান্তি হতো। যে এলাকায় দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল তা পারস্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে পারস্য ভূখণ্ডের অংশে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এটা রাশিয়ার ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী,' পৃষ্ঠা ১৫৩১-১৫৪০ দেখুন।

হাদীস শরীফ

মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য

১। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অপরের হাতে (অত্যাচারের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে কেউ মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন।"** *(বুখারী, মুসলিম)*

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"এক মুসলমান আর এক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি অবিচার করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র।"** *(মুসলিম)*

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের খাবার আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় খাবারের অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে কেউ এক মুসলমানের কাপড় (ছিনিয়ে নিয়ে) নিজে পরে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ঐ কাপড়ের অনুরূপ দোযখ হতে পরাবেন; এবং যে কেউ অন্যের সম্মানহানি করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার সম্মানহানি করবেন।"** *(আবু দাউদ)*

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য আয়নাস্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক মোমেন অপর মোমেনের জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মোমেন অপর মোমেনের ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাৎ হতেও রক্ষা করে।"** *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।"**

৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"দুই বান্দা, একজন প্রাচ্যের এবং অপরজন পাশ্চাত্যের, যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে তাহলে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি যাকে তুমি আমার জন্য ভালবেসেছিলে।"** *(বায়হাকী)*

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"কোন ব্যক্তির ওপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবি থাকে, এবং তা যদি তার সম্মানের ওপর অথবা অন্য কিছুর ওপর যুলুম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। অন্যথায় (কিয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ পুণ্য তার থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার পুণ্য না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষের (নির্যাতিতের) পাপ থেকে (যুলুমের সমপরিমাণ) তার হিসাবের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হবে।"** *(বুখারী)*

৮। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"প্রত্যেক ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের অনুষরণ করে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখা উচিত সে কি ধরনের বন্ধু নির্বাচন করছে।"** *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

৯। হযরত আবু মূসা আল্ আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **"কেউ যখন অন্য কাউকে পছন্দ করে তখন সে তার সাথী বলেই গণ্য হবে।"** অপর বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন এক ব্যক্তি অপর এক সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিনি (সা.) বলেন, **"কেউ যদি অন্য কাউকে পছন্দ করে, সেক্ষেত্রে তার পুনরুত্থান সেই ব্যক্তির সাথেই হবে।"** *(বুখারী, মুসলিম)*

১০। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক বেদুঈন মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কবে হবে? তিনি (সা.) বলেন, **"কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?"** সে বলল, আমার অন্য কোন পুণ্য নেই তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে আমি ভালোবাসি। তিনি (সা.) বলেন, **"তুমি যাকে ভালোবাস কিয়ামত দিবসে তার সাথেই থাকবে।"** *(বুখারী, মুসলিম)*

অমৃতবাণী

প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

নিজ সীমালঙ্ঘনের জন্য প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং হিসাব-নিকাশ দিবসকে স্মরণ রেখে আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। সে মুহূর্তকে ভয় করা উচিত, যখন পাপাচারীদের আক্ষেপ চরম পর্যায়ে পৌঁছুবে, আর সীমালঙ্ঘনকারীদের চেহারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হবে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি, শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর) এবং তৃতীয় জন অর্থাৎ হযরত যুন্নুরাঈন [অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)]-কে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর অগ্রসেনানী হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ-দৃষ্টিতে দেখে এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না, বরং তাদেরকে অপমান ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাঁদের প্রতি নোংরা আক্রমণ করে, আমি এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হবার আশংকা করি। যারা তাদের কষ্ট দেয়, অভিসম্পাত বর্ষণ করে, ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে–পরিণতিতে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়। এটি আমার বারবারের অভিজ্ঞতা এবং একথা আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সবচেয়ে বড় কারণ। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না।

আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইহজগতের মোহে ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহ্বরে পতিত হয় যা তাকে গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করে, ফলে তার বোধ-বুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে– অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রাসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রাসূলদের উত্তরাধিকারী, তা সাব্যস্ত হলো এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার দিবসে তাঁদের পুরস্কারও অবধারিত হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইহজগতের মোহে ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহ্বরে পতিত হয় যা তাকে গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করে, ফলে তার বোধ-বুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে– অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রাসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রাসূলদের উত্তরাধিকারী, তা সাব্যস্ত হল এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার দিবসে তাঁদের পুরস্কারও অবধারিত হয়ে গেল।

কেননা যদি কোন মু'মিনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আখ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয়, তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের সদৃশ হয়ে যান। তাঁকে নবীদের মত পুরস্কৃত করা হবে এবং তিনি রাসূলদের মতই পুরস্কার পাবেন। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মান ও মহিমার অধিকারী খোদার প্রশংসানুসারে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং সব মনোনীত লোকের ন্যায় তাঁদেরকেও তিনি তাঁর ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

[সির্‌রুল খিলাফাহ্ (বাংলা সংস্করণ) ২০-২১ পৃ: থেকে উদ্ধৃত]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৪২তম কিস্তি)

(১৩) তন্মধ্যকার, এ অধমের 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' হওয়ার সপক্ষে এটি এক নিদর্শন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্র আবির্ভাবের এক বিশেষ চিহ্ন হল, তিনি (ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী) দাজ্জালের 'খুরুজ' তথা বের হবার পর অবতীর্ণ হবেন। কেননা এটি এক সর্বস্বীকৃত বিষয় যে দাজ্জালের বেরিয়ে আসার পরে আগমনকারী হলেন সেই সত্য 'মসীহ্' যিনি 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' নামে অভিহিত। এ নামের তাৎপর্য সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে এমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দাজ্জালের কারণে মু'মিনদের তীব্র কষ্ট ও পরীক্ষাজনিত ধুলি-ধুসরিত মুখমণ্ডল থেকে দুঃখ বেদনা ও পেরেশানির চিহ্ন মুছে দিবেন। কেননা, 'মসীহ্' বলা হয় মুছে দেওয়াকে আর এথেকেই 'মসীহ্' শব্দেরও উৎপত্তি। তাই দাজ্জাল আসার পরেই মসীহ্র অবতরণ আবশ্যকীয়। অতএব, এ অধম ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দাজ্জাল বেরিয়ে আসার পরেপরে আবির্ভূত হয়েছে। কাজেই যদি প্রমাণিত হয় যে, পাদ্রি ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় (কুট) তর্কবিদ উপদেষ্টাদের দলটিই প্রকৃতপক্ষে দাজ্জাল– যারা দুনিয়াজুড়ে তাদের যাদুকরি কার্য-কলাপ দ্বারা পৃথিবীকে উলট-পালট করে ফেলেছে এবং ঠিক ওই সময় থেকে জোরে-শোরে ছুটে বেরিয়েছে। আর **"ইন্না আলা যিহাবিম্ বিহি লা-কাদেরূন"** (অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমরা পবিত্র কুরআনকে মানুষের কর্মদোষে এদের থেকে সরিয়ে নিতেও সর্বসক্ষম" –অনুবাদক) আয়াতটির আক্ষরিক মূল্যমানে ('আবজাদে'র নিয়মে গণনার দিক দিয়ে) যে সংখ্যা দাঁড়ায়, অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের যুগ* তাহলে এর সাথে সাথে অনায়াসে এ অধমের (আধ্যাত্মিকভাবে) প্রতিশ্রুত মসীহ্ হয়ে আগমনও প্রমাণিত হবে।

আমি আগেও লিখে এসেছি খ্রিষ্টান প্রচারকদের দলটিই নিঃসন্দেহে শেষ যুগে বেরিয়ে আসা দাজ্জাল। যদিও সাধারণভাবে হাদীসের বাহ্যিক বিবরণে প্রতীয়মান হয়, দাজ্জাল এমন এক বিশেষ ব্যক্তি– যার এক চোখ কানা এবং অপরটিও ত্রুটিযুক্ত। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ বর্ণিত এসব হাদীস যেহেতু 'কাশ্‌ফে'র অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু এগুলোতে চিরাচরিত

** **টীকা: "ইন্না আলা যিহাবিম্ বিহি লা-কাদেরূন"** (সূরা আল মুমিনুন: ১৯)– আয়াতটিতে খ্রিঃ ১৮৫৭ সনের যুগান্তকারী ঘটনার দিকে ইঙ্গিত। এ সনটিতেই ঘটেছিল চরম উশৃংখল এক বিদ্রহাত্মক দুর্ঘটনা যার দরুন ইসলামী সালতানাতের ধ্বংসাবশেষও ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কেননা এ আয়াতের বর্ণমালার মান নির্ণয়ে আরবী আবজাদের নিয়মে যে সংখ্যা দাঁড়ায় সেটি ১২৭৪। আর এটি খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডারে দেখা যায় ১৮৫৭। অতএব প্রকৃপক্ষে ইসলামে দুর্বলতার সূচনার যুগ ওই ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ। এ সম্পর্কে খোদা তা'লা উক্ত আয়াতে বলেন যে, ঐ সময় পবিত্র কুরআনকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। অতএব ১৮৫৭ সালে মুসলমানদের অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, কদাচার ও পাপাচার ছাড়া মুসলমান রয়ীসদের অন্য কিছুই স্মরণ ছিল না। জনসাধারণের ওপর এর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। এ সময়েই তারা এক অন্যায় ও অশিষ্ট উপায় অবলম্বনে, ইংরেজ সরকারের অনুগত প্রজা হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহ করেছিল। অথচ তাদের পক্ষে ওরূপ সন্ত্রাস এবং ওরূপ 'জিহাদ' শরীয়ত-সম্মত ছিল না। কেননা তারা এই সরকারের প্রজা ও অধীনস্থ ছিল এবং এর ছত্র-ছায়ায় শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনে সমর্থ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিদ্রোহ ও সন্ত্রাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও 'কবিরা গোনাহ' এবং এক অতি ঘৃণ্য কুকর্ম বিশেষ ছিল। আমরা যখন ১৮৫৭ সালের ঘটনাবলীতে দৃষ্টিপাত করি এবং ওই যুগের মৌলবীদের ফতোয়াসমূহে দৃষ্টি দেই যাতে সাধারণভাবে ইংরেজদের হত্যা করা উচিত বলে তারা নিজেদের সিলমোহর যুক্ত করেছিল তখন আমরা এটা ভেবে চরম লজ্জার সাগরে ডুবে যাই যে, এরা কী ধরনের মৌলবী ছিল এবং কীরকম ছিল তাদের ঐসব ফতোয়া! তাদের মাঝে না ছিল দয়া-মায়া, না জ্ঞান-বুদ্ধি, না আখলাক বা নৈতিকতাবোধ এবং ন্যায় বিচার!! ওই লোকেরা চোর ডাকাত ও তস্কর ও বজ্জাতদের মত তাদের উপকারকারী উদার সরকারের ওপর হামলা চালায় আর এর নাম রাখে জিহাদ। ছোট ছোট শিশু ও নিরপরাধ নারীদের তারা হত্যা করে। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের পানি পর্যন্ত পান করতে দেয় নি।*

ঐশী ধারায় ও ঐশী বিধান অনুযায়ী 'ইস্তিআরা' বা উপমা ও 'মাজায' বা রূপকতার প্রধান্য থাকে– যেমন ইমাম মোল্লা আলী ক্বারীও লিখেছেন। আর তেমনি 'সালফে-সালেহ্' বা পূর্ববর্তী প্রাথমিক সৎ-সালেহ বুযুর্গান সর্বদা এসব হাদীসের রূপক অর্থই গ্রহণ করেছেন, সেহেতু জোরালো কারণ ও বলিষ্ঠ প্রমাণ থাকার প্রেক্ষিতে আমরা দাজ্জাল শব্দটিকে কেবল একজন ব্যক্তিবিশেষ বুঝায় বলে গ্রহণ করতে পারি না। 'রুইয়া' বা সত্যস্বপ্ন এবং 'কাশ্‌ফ' (বা দিব্যদর্শন) এ ধারাতেই চলমান ঐশী বিধানে পর্যবসিত। যেমন, আমাদের নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি আরবের একজন বাদশাহ্‌কে স্বপ্নে দেখেছিল। তখন তিনি (সা.) বলেছিলেন যে, এ দ্বারা আরব দেশ বা জাতি বুঝায় যা নিঃসন্দেহে দল বটে। আর আমার এই বর্ণনার সপক্ষে এ-ও এক সবাক (প্রকাশ্য) সাক্ষ্য বিশেষ যে, 'দাজ্জাল' প্রকৃতপক্ষে অভিধান অনুযায়ী 'ইস্‌মে জিনস্' (বা শ্রেণীমূলক বিশেষ্য)। এদ্বারা এরকম লোকদের বুঝায় যারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। সুতরাং আরবী অভিধান-গ্রন্থ 'ক্বামূসে' এ অর্থই লেখা আছে যে, দাজ্জাল সেই দলকে বুঝায়–যারা মিথ্যাকে সত্যের সাথে মিশিয়ে উপস্থাপনকারী এবং পৃথিবীকে অপবিত্রে পরিণতকারী হয়ে থাকে। আর 'মিশকাত, কিতাবুল ফিতানে' সহীহ্ মুসলিম বর্ণিত একটি হাদীস লিখা আছে, এতে 'দাজ্জাল' একটি দল হওয়ার দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

আদমের জন্মলগ্ন থেকে কিয়ামতকাল ব্যাপী কোনো ফিৎনা বা নৈরাজ্য দাজ্জালের ফিৎনার চেয়ে বৃহত্তর নয়–অর্থাৎ দ্বীনে-ইসলামকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে যে-পরিমাণ মূলউৎপাটনমূলক কার্যক্রম তাদের মধ্য থেকে প্রকাশিত হবে তা কিয়ামত দিবস অবধি অন্য কারও দিক থেকে সংঘটিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে না।

(সহীহ মুসলিমে বর্ণিত)

অতএব, জানা আবশ্যক, চিহ্নিত দাজ্জালের বড় আলামত বা চিহ্নগুলো হাদীসমূহে নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ রয়েছে:

(১) আদমের জন্মলগ্ন থেকে কিয়ামতকাল ব্যাপী কোনো ফিৎনা বা নৈরাজ্য দাজ্জালের ফিৎনার চেয়ে বৃহত্তর নয়–অর্থাৎ দ্বীনে-ইসলামকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে যে-পরিমাণ মূলউৎপাটনমূলক কার্যক্রম তাদের মধ্য থেকে প্রকাশিত হবে তা কিয়ামত দিবস অবধি অন্য কারও দিক থেকে সংঘটিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে না। *(সহীহ মুসলিমে বর্ণিত)*

(২) দাজ্জালকে মহানবী (সা.) 'কাশফ ও রুইয়া' যোগে প্রত্যক্ষ করেছেন যে ডান চোখে সে কানা হবে এবং তার অপর চোখটাও ত্রুটিযুক্ত–অর্থাৎ ধর্মীয় শুভদৃষ্টি তাকে একেবারেই দেয় হয়নি, এবং জাগতিক উপকরণাদি অর্জনও হালাল ও তৈয়ব' বা সিদ্ধ ও পবিত্র নয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৩) দাজ্জালের সঙ্গে থাকবে জান্নাতসূলভ ভোগ ও আরাম আয়েশের উপায়-উপকরণ আর সেই সাথে দুঃখ ও বালা-মুসিবতের দোযখসূলভ কিছু উপকরণও থাকবে। (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)। নিত্যনুতন যে-বিপুল পরিমাণ ভোগ ও আরামের উপাদান খ্রিষ্টান জাতিবর্গ আবিষ্কার করেছে এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বনে দুঃখ-বেদনা ও ক্ষুধা-দুর্বিক্ষও তাদের কিছু ব্যবস্থাদীর দরুন দেশবাসীদের কবলগ্রস্ত করে চলেছে। উক্ত উভয় অবস্থা বেহেশ্‌ত ও দোযখের নমুনা স্বরূপ নয় তো আর কী?

এটাই কী প্রকৃত ইসলাম ছিল? না-কি ইহুদীদের হীন স্বভাব?! কোন ব্যক্তি কি দেখাতে পারে খোদা তা'লা তাঁর পবিত্র কালামে কোথায় এরূপ জিহাদের আদেশ দান করেছেন?! অতএব, সেই মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন যে, খ্রি. ১৮৫৭ সালে তাঁর মহতী এই কালামকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হবে–এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, মুসলমানরা এর আদেশ মেনে চলবে না, এর হুকুম পালন করবে না। এরই পরিচয় তারা তখন তাদের কার্যকলাপে দিয়েছে। আর খোদা তা'লার প্রতি এই ইল্‌যাম বা অপবাদ দেওয়া যে, এরূপ জিহাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ তাঁর আদেশে তারা করেছিল এটা আরেক গোনাহ। খোদা তা'লা কি এ শরীয়ত বা বিধান শিখিয়েছেন আমরা যেন পুণ্যের জায়গায় অন্যায় ও কুকর্ম করি? এবং আমাদের নিজেদের উপকারকারী সরকারের ইহ্‌সান ও উপকারের এই বদলা দেই যে তাদের জাতির ছোট বাচ্চাদের অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করি এবং তাদের জীবন-সঙ্গিনীদের টুকরা-টুকরা করে ফেলি?! নিঃসন্দেহে এই দাগ ও কলঙ্ক আমরা মুসলমানদের, বিশেষত: অধিকাংশ মৌলবীদের কপাল থেকে মুছে ফেলতে পারি না। – তাঁরা যে ১৮৫৭ সালে ধর্মের আড়ালে এমন বিরাট গোনাহ বা জঘন্য অপরাধ করেছে যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল এটুকুই নয়, বরং তাঁরা আরও এমন সব খারাপ কাজ করেছে যা কেবল বন্য জন্তুদের স্বভাবে দেখতে পাওয়া যায়; এগুলো মানুষের স্বভাব বহির্ভূত। তারা ভাবলো না ও বুঝলো না যে, তাদের সাথে যদি এসব কান্ড ঘটানো হয় যে তাদের অনুগ্রহভাজন কেউ তাদের শিশুদের মেরে ফেলে এবং তাদের স্ত্রীদের খণ্ড-বিখণ্ড করে তাহলে তাদের মনে কী ধারণার উদ্ভব হবে?! তা সত্ত্বেও এ সকল মৌলবী লোক অহঙ্কার দেখায় যে তারা কি-না বড় মুত্তাকী-পরহেজগার। এভাবে মুনাফিকী জীবন যাপন করা, কে জানে তারা কোথা থেকে শিখলো?!

(৪) দাজ্জালের কতক দিন বছরের তুল্য হবে এবং কতক দিন হবে মাসের মত হবে এবং কিছুদিন সপ্তাহের মত। কিন্তু এমন নয় যে দিনগুলোতে পার্থক্য হবে, বরং পরিমাপে তাদের দিন এমনই হবে যেমন তোমাদের দিন হবে।

(৫) দাজ্জালের গাধা এতো দীর্ঘকায় হবে যে তার দুই কানের মাঝে সত্তর বাহু সমান ব্যবধান হবে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এত দীর্ঘকায় বিশিষ্ট গর্ধবী খোদা তা'লা সৃষ্টি করেন নি যাতে আশা করা যায় যে তাদের প্রজন্ম বা সন্তানাদির থেকে ওই গাধা জন্মাবে।

(৬) দাজ্জাল যখন গাধার ওপর সাওয়ার হবে তখন গাধাটি এত দ্রুত বেগে চলবে যেমন– মেঘপুঞ্জ এমতাবস্থায় দ্রুত বেগে চলে যখন তারা পেছনে বেগবান হওয়া থাকে। এটি এ বিষয়ের দিকে এক সূক্ষ্ম ইঙ্গত যে, দাজ্জালের গাধা কোন প্রাণবিশিষ্ট জীব হবে না। বরং সেটি কোন বায়ুবিয় পদার্থের জোরে জালিত হবে।

(৭) পৃথিবী ও আকাশমালা দাজ্জালের অনুসারী ও অনুগামী হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা ওই তদবির বা কৌশলকে তকদির বা নিয়তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাব্যস্ত করবেন এবং দাজ্জালের হাতে, তার নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেবেন।

(৮) দাজ্জাল পূর্ব দিক দিয়ে বের হবে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে। কেননা এদশেটি আরবদেশ হিজাজের পূর্ব দিকে অবস্থিত। (বুখারী ও মুসিলম উভয় সহীহ্ হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত)।

(৯) দাজ্জাল যে- কোন ধুসর প্রান্তর অতিক্রম করবে সেটিকে সে বলবে, 'তোর ভেতর অবস্থিত সব রত্নভাণ্ডার বের কর দে।'

দাজ্জাল যখন গাধার ওপর সাওয়ার হবে তখন গাধাটি এত দ্রুত বেগে চলবে যেমন– মেঘপুঞ্জ এমতাবস্থায় দ্রুত বেগে চলে যখন তারা পেছনে বেগবান হওয়া থাকে। এটি এ বিষয়ের দিকে এক সূক্ষ্ম ইঙ্গত যে, দাজ্জালের গাধা কোন প্রাণবিশিষ্ট জীব হবে না। বরং সেটি কোন বায়ুবিয় পদার্থের জোরে জালিত হবে।

(সহীহ মুসলিমে বর্ণিত)

অতএব ওইসব ভাণ্ডার বেরিয়ে আসবে এবং দাজ্জালের পেছনে-পেছনে ধাবিত হবে। এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত যে, দাজ্জাল পৃথিবী থেকে প্রভূত উপকার লাভ করবে, অনেক ফায়েদা লুটবে এবং নিজ কলা-কৌশলের মাধ্যমে আবাদ করবে– ধুসর প্রান্তরকে রত্নভাণ্ডারে ভরপুর করে দেখাবে। অতঃপর অবশেষে 'বাবে-লুদ্দ' বা কূটতর্কের দরোজায় এসে সে নিহত হবে। জানা আবশ্যক, 'লুদ্দ' ওই সব লোকদের বলা হয় যারা অত্যন্ত অযথা কূট তর্ককারী হয়ে থাকে। এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত যে, দাজ্জালের কূটতর্ক যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে তখন 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' আত্মপ্রকাশ করবেন, আবির্ভূত হবেন এবং দাজ্জালের সব রকম ঝগড়ার অবসান ঘটাবেন।

(১০) দাজ্জাল নিজেকে খোদা বলে অভিহিত করবে না, বরং খোদা তা'লাকে স্বীকার করবে, বরং কতক নবীদের প্রতিও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। (সহীহ মুসলিমে বর্ণিত)।

উল্লিখিত এ দশটি আলামত বা চিহ্নের মাঝে অন্যতম ভারি ও জোরালো এ চিহ্নটি লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, তার নৈরাজ্য সমস্ত ঐসব ফেৎনা বা নৈরাজ্য যা রব্বানী দ্বীন বা ঐশী ধর্মমতকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মানুষ আবহমান কাল থেকে চেষ্টা করে আসছে এটি ওইসবগুলোর চেয়ে মারাত্মক হবে। আমি এ পুস্তকটিতেই প্রমাণ করে এসেছি যে, এ আলামত বা চিহ্নটি খ্রিষ্টান মিশন সমূহে দৃশ্যমান, সুপ্রকাশমান বটে।... *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অবঃ)

ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভ্রান্তিযুক্ত কিছু তফসীর এঁদের অনেক ক্ষতি করেছে। এসব তফসীরে ঢুকে পড়া কিছু গলদ তথ্যমূলক উপাদান তাদের ধ্যান ও চিন্তা- চেতনা এবং হৃদয় ও মস্তিষ্কসম্পৃক্ত শক্তিগুলোতে অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। আর তাই এ যুগে নিঃসন্দেহে ঐশী কালাম আল-কুরআনের ক্ষেত্রে এর এক নতুন ও সহীহ্ তফসীর প্রণয়ন আবশ্যকীয়। কেননা, সাম্প্রতিককালে যে তফসীরগুলোর শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে না নৈতিক অবস্থা শুধরাতে পারে, আর না এতে ঈমানী অবস্থার ওপর নেক ও কল্যাণকর প্রভাব ফেলতে পারে। বরং এগুলোতে স্বভাবজ কল্যাণ ও সৌভাগ্য এবং শুভ আলোকপাতে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। এর কারণ হলো, এগুলো প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হওয়ার দরুন কুরআন করীমের শিক্ষা নয়। কুরআনিক শিক্ষা এরূপ লোকদের হৃদয় থেকে মুছে গেছে। অন্য কথায়, কুরআন যেন আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই ঈমান যা কুরআন শিখিয়েছিল এথেকে মানুষ বে-খবর। পবিত্র কুরআন যে-ইরফান বা সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব দান করেছিল তাথেকে মানুষ গাফিল ও উদাসীন। তবে এটা সত্য যে তারা কুরআন পড়ে, কিন্তু পবিত্র কুরআন তাদেন কণ্ঠনালীর নীচে নামে না, এ অর্থেই বলা হয়েছে যে, আখেরী যুগে কুরআনকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হবে। আবার এ হাদীসসমূহে-ই লেখা আছে, পুনরায় কুরআনকে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী একজন পারস্য বংশোদ্ভুত ব্যক্তি হবেন। যেমন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন: "লাও কানাল ঈমানু মুআল্লাক্বান্ ইন্দাস্ সুরাইয়া লানালহু রাজুলুম্ মিন্ ফারিস" (অর্থাৎ- ঈমান যদি পৃথিবী থেকে ওঠে আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলীতেও আটকে থাকে তবু সেটি পারস্য বংশোদ্ভুত এক মহাপুরুষ সেখান থেকে ধরাপৃষ্ঠে নামিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন" (বুখারী কিতাবুত তফসীর)। –অনুবাদক।

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
০৩ মে ২০১৯ মোতাবেক ০৩ হিজরত ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-'গণের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ

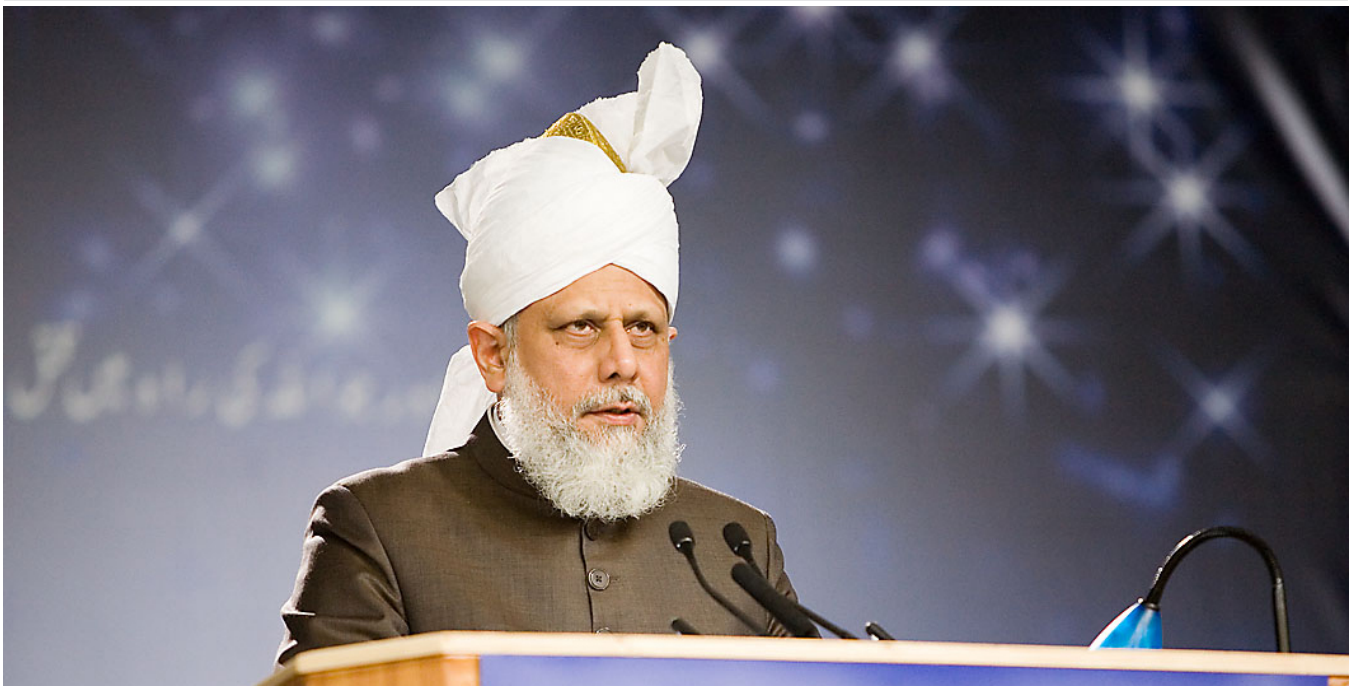

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হল হযরত উবায়েদ (রা.)। তার পুরো নাম ছিল হযরত উবায়েদ বিন আবু উবায়েদ আনসারী মুহ্সী (রা.)। ইবনে হিশামের মতে তিনি অউস গোত্রের বনু উমাইয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন। হযরত উবায়েদ (রা.) মহানবী (সা.) এর সাথে বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। (উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ, আল মুজাল্লাদুস সালেস, পৃ. ৫৩৮-৫৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০৮) (সিরাতুন নববিয়্যা লে ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৬৫, আল আনসারু ওয়া মান মাআহু, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১) (আত তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৩, ওয়া মান খুলাফাই বানি যাফর, উবায়েদ ইবনে আবি উবায়েদ, দারুল এহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত, লেবানন ১৯৯৬) এর বেশি তার সম্পর্কে জানা যায় নি।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নোমান বিন বালদামা (রা.)। হযরত আব্দুল্লাহ্-র দাদার নাম বালদামা বা বালযামা-ও বলা হয়ে থাকে। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু খুনাস বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। *(সিরাতুন নববিয়্যা লে ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৭১, আল আনসারু ওয়া মান মাআহু, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১) (আল ইসাবাহ ফি তামিযিস সাহাবাহ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২১৩, আব্দুল্লাহ বিন আননু'মান, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন ২০০৫)*

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নোমান হযরত আবু কাতাদা-র চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। *(আত তাবাকাতুল*

কুবরা লে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩, তাবাকাতুল বাদরিয়্যিনা মিনাল আনসার, আব্দুল্লাহ বিন নু'মান, দারুল এহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত ১৯৯৬)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমায়ের (রা.)। তিনি বনু জিদারা গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক উক্তি অনুযায়ী তার (রা.) পিতার নাম উমায়ের-এর পরিবর্তে উবায়েদও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কেউ কেউ তার (রা.) দাদার নাম আদী বর্ণনা করেছে, অপরদিকে কেউ কেউ হারেসা উল্লেখ করেছে। ইবনে হিশাম বনু জিদারাকে তার গোত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আর ইবনে ইসহাক বনু হারেসা বর্ণনা করেছেন। *(সিরাতুন নববিয়্যা লে ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৬৭, আল আনসারু ওয়া মান মাআহুম/মিন বানি জুদারাহ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১) (আত তাবাকাতুল কুবরা লে ইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৭, আব্দুল্লাহ বিন উমায়ের, দারুল এহইয়াউত তারাসুল আরাবী, ১৯৯৬) (আল ইসাবাহ ফি তামিযিস সাহাবাহ লে ইবনে হাজার আসকালানী, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭২, আব্দুল্লাহ বিন উমায়ের, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০৫) এদের উভয়েই ঐতিহাসিক।*

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আমর বিন হারেস (রা.)। তিনি (রা.) বনু হারেস গোত্রের সদস্য ছিলেন। কেউ কেউ তার নাম আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, অথচ অন্যরা তার নাম আমের (রা.)ও বলে থাকেন। তার উপনাম ছিল আবু নাফে (রা.)। হযরত আমর প্রাথমিক যুগেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। *(সিরুতুন নববিয়্যাহ লেইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৪৬৩, বাব মান হাযারা বাদরাম মিনাল মুসলিমিন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১) (আল ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব লি আবি উমার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫, ওমর বিন হারেস, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০২) (উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা লেইবনে আসির, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭, আমর বিন হারেস, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০৮)*

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব (রা.)। তিনি বনু মাযন গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল কাব বিন আমর আর মাতার নাম ছিল রুবাব বিনতে আব্দুল্লাহ্। তিনি হযরত আবু লায়লা মাযনি-র ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাবের (রা.) এক পুত্রের নাম ছিল হারেস যিনি যুহায়বা বিনতে অউস-এর গর্ভজাত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) তাকে গনিমতের সম্পদের নিগরান নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া অন্যান্য উপলক্ষ্যেও মহানবী (সা.)-এর খোমোসের (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য নির্ধারিত এক পঞ্চমাংশ সম্পদের) নিগরান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব (রা.) উহুদ, খন্দক এবং এছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে ৩৩ হিজরীতে মদিনায় তার মৃত্যু হয়। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। তার উপনাম আবু হারেস (রা.), এর পাশাপাশি আবু ইয়াহিয়া (রা.)-ও বলা হয়ে থাকে। *(সিরুতুন নববিয়্যাহ লেইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৪৪৭৫, আল আনসার ওয়ামান মাআহুম/মিন বানি মাযন বিন নাজ্জার ওয়া হুলাফায়িহিম. দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ২০০১) (আত তাবাকাতুল কুবরা লেইবনে সা'দ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৮, আব্দুল্লাহ বিন কা'ব বিন আমর, দারুল এহইয়াউত তারাসুল আরাবী, বৈরুত লেবানন ১৯৯৬) (আল ইসতিআব ফি মা'রিফাতিল আহসহাব, আল মুজাল্লাদুস সালেস, পৃ. ১০৫, আব্দুল্লাহ বিন কা'ব আলমাযনী, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত লেবানন ২০০২) (উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ, আল মুজাল্লেদুস সালেস, পৃ. ৩৭০, আব্দুল্লাহ বিন কা'ব বিন আমর, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবান ২০০৮)*

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রা.)। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার দাদার নাম সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খালেদ বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য তাবাকাতুল কুবরায় তার নাম খালাদা লেখা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রা.)-এর পুত্রের নাম ছিল আব্দুর রহমান এবং কন্যার নাম ছিল উমায়রা। তাদের উভয়ের মায়ের নাম ছিল সুয়াদ বিনতে কায়েস । এছাড়া তার আরো এক কন্যা ছিলেন যার নাম ছিল উম্মে অউন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন উমারা আনসারীর মতে তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু অপর এক উক্তি অনুযায়ী তিনি (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন নি, বরং তিনি (রা.) জীবিত ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হযরত উসমান-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। *(আস সীরাতুন্নাবুবীয়া, ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৭৪, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮, আব্দুল্লাহ বিন কায়েস, দার আহইয়াউল তুরাস আল আরাবী, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে কোথাও কোথাও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাই আমি সেগুলোও উল্লেখ করে দেই।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)। হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.) বনু হারেসা বিন হারেস গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার (রা.) পিতার নাম ছিল আসলাম। এক উক্তি অনুযায়ী তার দাদার নাম ছিল হারীশ, কিন্তু অপর উক্তি অনুযায়ী

তার নাম ছিল হারিস। তার (রা.) ডাকনাম ছিল আবু সাদ। *(আস সীরাতুন্নাবুবীয়া, ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৬৪, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল ইসতিয়াব ফী মা'রেফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৮, সালামা বিন আসলাম, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)-এর মায়ের নাম ছিল সুয়াদ বিনতে রাফে। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক বা পরিখার যুদ্ধসহ এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে সায়েব বিন উবায়েদ এবং নোমান বিন আমরকে তিনি বন্দি করেছিলেন। হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে জিসর্-এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, যা ফোরাৎ নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আমি বিগত খুতবা সমূহে প্রদান করেছি। এটি অনেক বড় যুদ্ধ ছিল, যা মুসলমান এবং ইরানীদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। জিসর্ বলা হয় সেতুকে। নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে মুসলমানরা অন্য অঞ্চলে গিয়েছিল। আর এই যুদ্ধে ইরানীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য হাতীও ব্যবহৃত হয়েছিল। যাহোক, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মৃত্যুকালে তার বয়স ৩৮ বছরের কিছুটা কম বা বেশি বলা হয়ে থাকে। *(আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬, সালামা বিন আসলাম, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উসদুল গাবা ফী মা'রেফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৬, সালামা বিন আসলাম, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (আল-ইসাবাতু ফী তাময়ীযিস্ সাহাবা, ইবনে হাজার আসকালানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২০, সালামা বিন আসলাম, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (তারীখ ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, প্রথমাংশ, পৃ. ২৭১, ২০০৩ সনে করাচিতে মুদ্রিত)*

আল্লামা নূরুদ্দিন হালবী-র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সীরাতে হালবিয়ায় বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর মু'জিযা সমূহের প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)-এর তরবারি ভেঙে গেলে মহানবী (সা.) তাকে খেজুর গাছের লাঠি দিয়ে বলেন, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। হযরত সালামা বিন আসলাম সেই লাঠি হাতে নিতেই সেটি এক উৎকৃষ্ট তরবারিতে রূপ নেয় এবং পরবর্তীতে সেটি সবসময় তার (রা.) কাছে সংরক্ষিত ছিল। *(সীরাতুল হালবীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৫, যিকরে মাগাজী সা., গাজওয়ায়ে বদর, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

'শারাহ্ যুরকানী' এবং 'দালায়েলে নবুওয়্যত' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)-এর তরবারি ভেঙে গেলে তিনি শূন্য হাতে ছিলেন। তার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। মহানবী (সা.) তাকে একটি ছড়ি বা লাঠি জাতীয় কিছু দিয়ে বলেন যে, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। তখন তা এক উৎকৃষ্ট তরবারিতে রূপ নেয় যা জিসর্-এর যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত তার কাছে ছিল।

'শারাহ্ যুরকানী' এবং 'দালায়েলে নবুওয়্যত' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)-এর তরবারি ভেঙে গেলে তিনি শূন্য হাতে ছিলেন। তার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। মহানবী (সা.) তাকে একটি ছড়ি বা লাঠি জাতীয় কিছু দিয়ে বলেন যে, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। তখন তা এক উৎকৃষ্ট তরবারিতে রূপ নেয় যা জিসর্-এর যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত তার কাছে ছিল। *(শারাহ যুরকানী আলাল মাওয়াহেবুদদুনিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০২, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (দালায়েনুল নবুওয়া লিল বায়হাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯, ১৯৮৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

ইবনে সাদ খন্দকের যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় মুহাজেরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর কাছে ছিল আর আনসারদের পতাকা ছিল হযরত সাদ বিন উবাদা (রা.)-এর কাছে। মহানবী (সা.) হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)-কে দুই শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। সেসব পতাকার নীচে বিভিন্ন দল ছিল আর তাদের জন্য একেক জন করে নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল। হযরত সালামা (রা.)-কে দুই শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)কে তিন শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর তাদেরকে তিনি (সা.) এই দায়িত্ব প্রদান করেন যে, তারা মদিনায় পাহারা দিবে এবং উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করতে থাকবে। এর কারণ হলো, শিশুদেরকে যেখানে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল সেখান থেকে বনু কুরায়যার পক্ষ হতে হামলা হওয়ার আশঙ্কা ছিল। *(উয়ুনুল আসার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৮, গাজওয়াতুল খন্দক, ১৯৯৩ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল আর এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন-

আহযাবের যুদ্ধে লাঞ্ছনাজনক পরাজয়ের স্মৃতি মক্কার কুরাইশদের দেহমনে আগুন লাগিয়ে রেখেছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই

এই হৃদয়াগ্নি আবু সুফিয়ানের মনে সবচেয়ে বেশি জ্বলছিল, যে কিনা মক্কার নেতা ছিল এবং পরিখার অভিযানে বিশেষভাবে লাঞ্ছনাজনক চপেটাঘাত খেয়েছিল। আবু সুফিয়ান এই ক্রোধাগ্নিতে কিছুকাল পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। কিন্তু অবশেষে বিষয়টি তার সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। আর এই ক্রোধাগ্নির সুপ্ত স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসা আরম্ভ হয় এবং সেগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কাফেরদের সবচেয়ে বেশি শত্রুতা বরং আসল শত্রুতা ছিল মহানবী (সা.)-এর সাথে। তাই আবু সুফিয়ান ভাবলো যে, যেখানে বাহ্যিক চেষ্টা, ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের কোন ফলাফল প্রকাশ পায় নি, তাই গোপনভাবে কোন ষড়যন্ত্র বা বাহানা ও ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে কেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনাবসান ঘটানো হবে না, কেন এমন কোন পরিকল্পনা করা হবে না? সে জানতো যে, মহানবী (সা.)-এর আশপাশে বিশেষ কোন পাহারা থাকে না, বরং অনেক সময় তিনি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় এখানে সেখানে যাতায়াত করতেন, শহরের অলিগলিতে চলাফেরা করতেন। মসজিদে নববীতে প্রত্যহ কমপক্ষে পাঁচবার নামাযের জন্য আসতেন। আর সফরের সময় সম্পূর্ণ অকৃত্তিম ও স্বাধীনভাবে থাকতেন। কোন ভাড়াটে হন্তারকের জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে? এ ধারণা হৃদয়ে জাগ্রত হতেই আবু সুফিয়ান সংগোপনে মহানবী (সা.)-কে হত্যার বাসনাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া আরম্ভ করে। এ ধারণায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একদিন সুযোগ পেয়ে সে তার কাজে আসবে এমন কতিপয় কুরাইশী যুবককে বলে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন সাহসী পুরুষ নেই, যে মদিনায় গিয়ে গোপনভাবে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে? তোমরা জান যে, মুহাম্মদ (সা.) প্রকাশ্যে মদিনার অলিগলিতে চলাফেরা করেন। সে নিজের মতো করে মহানবী (সা.) সম্পর্কে এসব কথা তুলে ধরে। সেই যুবকরা এই প্রস্তাব শুনে এবং এটিকে গ্রহণ করে (আর তাদের হৃদয়ে এ কথা ঘর করে নেয়।) এ কথা প্রকাশ পাওয়ার স্বল্পকাল পর এক মরুবাসী যুবক আবু সুফিয়ানের কাছে আসে এবং

যখন তাকে পরাস্ত করে কাবু করে ফেলা হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, সত্যি করে বল তুমি কে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? সে বলে, আমায় প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হলে আমি বলব। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, যদি তুমি সমস্ত কথা সত্যি করে বল তাহলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। তখন সে পুরো ঘটনার আদ্যপ্রান্ত মহানবী (সা.)-এর কাছে বর্ণনা করে আর এ কথাও বলে যে, আবু সুফিয়ান তার সাথে এত পরিমাণ পুরস্কারের ওয়াদা করেছিল। অতঃপর সেই ব্যক্তি কয়েক দিন পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করে। এরপর স্বেচ্ছায় মহানবী (সা.)-এর কথা শুনে আর মুসলমানদের সাহচর্যে থেকে মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।

বলে যে, আমি আপনার প্রস্তাব শুনেছি (কোন যুবক তাকে অবহিত করে থাকবে)। আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি। আমি একজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ও কাজে পরিপক্ক, যার পাকড়াও কঠোর এবং হামলা তড়িৎ। আপনি যদি আমাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করে আমার সাহায্য করেন তাহলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে যেতে প্রস্তুত আছি। আমার কাছে এমন একটি খঞ্জর আছে যা শিকারী শকুনের গোপন পালকের মতো থাকবে। অর্থাৎ সেটিকে অনেক আড়ালে আবডালে রাখব। আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর হামলা করব এবং এরপর পালিয়ে কোন কাফেলায় মিশে যাব। মুসলমানরা আমাকে ধরতে পারবে না। মদিনার পথঘাটও আমার নখদর্পনে। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং বলে যে, যথেষ্ট হয়েছে, তুমিই আমাদের কাজের লোক। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাকে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রী ও পথখরচ দিয়ে বিদায় দেন এবং নসীহত করে বলেন, এই গোপন কথা কেউ যেন জানতে না পারে।

মক্কা থেকে বিদায় নিয়ে এই ব্যক্তি দিনে আত্মগোপন করে আর রাতে সফর করে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। ষষ্ঠ দিন সে মদিনা পৌঁছে যায় আর মহানবী (সা.)-এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে সোজা বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের মসজিদে পৌঁছে যেখানে মহানবী (সা.) তখন উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনগুলোতে যেহেতু নিত্যনূতন মানুষ মদিনায় আনাগোনা করত তাই তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন মুসলমানের সন্দেহ হয় নি যে, সে কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছে? কিন্তু যখনই সে মসজিদে প্রবেশ করে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের দিকে অগ্রসর হতে দেখে বললেন, এই ব্যক্তি কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এসেছে। মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে এই কথা বলেছিলেন যা সেই ব্যক্তির কানেও পৌঁছে। এই কথা শুনে সে আরো দ্রুত তাঁর (সা.) দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু একজন আনসারী নেতা উসায়েদ বিন হুযায়ের তাৎক্ষণিকভাবে লাফিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন। ধস্তাধস্তিতে তার হাত সেই ব্যক্তির

লুকানো ছুরির ওপর গিয়ে পড়ে। তখন সে বিচলিত হয়ে বলে উঠে যে, আমার রক্ত, আমার রক্ত। অর্থাৎ আমাকে তুমি আহত করে দিয়েছে। যখন তাকে পরাস্ত করে কাবু করে ফেলা হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, সত্যি করে বল তুমি কে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? সে বলে, আমায় প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হলে আমি বলব। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, যদি তুমি সমস্ত কথা সত্যি করে বল তাহলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। তখন সে পুরো ঘটনার আদ্যপ্রান্ত মহানবী (সা.)-এর কাছে বর্ণনা করে আর এ কথাও বলে যে, আবু সুফিয়ান তার সাথে এত পরিমাণ পুরস্কারের ওয়াদা করেছিল। অতঃপর সেই ব্যক্তি কয়েক দিন পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করে। এরপর স্বেচ্ছায় মহানবী (সা.)-এর কথা শুনে আর মুসলমানদের সাহচর্যে থেকে মহানবী (সা.)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু সুফিয়ান কর্তৃক এই হত্যার ষড়যন্ত্র মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ও অবহিত থাকার বিষয়টিকে আরো বেশি আবশ্যক করে তুলে, অর্থাৎ এটি জানা আবশ্যক হয়ে যায় যে, তাদের নিয়্যত কী, কেননা তারা গোপন ষড়যন্ত্রও করছে। অতএব মহানবী (সা.) এ উদ্দেশ্যে আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) এবং সালামা বিন আসলাম যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে নিজের এই দু'জন সাহাবীকে মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং আবু সুফিয়ানের হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তার পূর্বের রক্তক্ষয়ী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তাদেরকে এই অনুমতিও প্রদান করেন যে, সুযোগ পেলে ইসলামের এই চরম শত্রুসেনাকে যেন হত্যা করে। কিন্তু যখন উমাইয়্যা এবং তার সঙ্গী মক্কায় পৌঁছেন তখন কুরাইশরা সতর্ক হয়ে যায়। আর এই উভয় সাহাবী নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে মদিনা অভিমুখে ফিরে আসেন। পথিমধ্যে তারা কুরাইশদের দু'জন গুপ্তচরকে পেয়ে যান যাদেরকে কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে জানার জন্য এবং মহানবী (সা.)-এর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিল। এটিও অসমম্ভব নয় যে, কুরাইশদের এই পরিকল্পনাও হয়ত হত্যার অন্য কোন ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়ে থাকবে। যেমনটি তারা পূর্বেও এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিল, হতে পারে একই উদ্দেশ্যে এদেরকেও প্রেরণ করেছে, যেন তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে হত্যা করতে পারে। কিন্তু খোদার এমন কৃপা হয়েছে যে, উমাইয়্যা এবং সালামা বিন আসলাম (রা.) তাদের গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে জেনে যান, যার ফলে তারা এই গুপ্তচরদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে বন্দি করতে প্রয়াশী হলেন। কিন্তু তারাও মোকাবিলা করে। অতঃপর এই লড়াইয়ে একজন গুপ্তচর নিহত হয় আর দ্বিতীয় জনকে বন্দি করে তারা নিজেদের সাথে মদিনায় নিয়ে যান।

এই অভিজানের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনে হিশাম এবং তাবারী এটি ৪ হিজরীতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনে সাদ এটিকে ৬ হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা কুসতালানী এবং যারকানী ইবনে সাদ-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এদের সবার মতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন, অতএব আমিও এটিকে ৬ হিজরীর ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেছি, বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, ওয়াল্লাহু আ'লামু। বায়হাকীও ইবনে সাদের বর্ণিত বিষয়ের সমর্থন করেছেন, কিন্তু তাতে এই ঘটনার সময়কাল সম্পর্কে জানা যায় না। *(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব রচিত, সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃ. ৭৪১-৭৪৩)*

হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.)-এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত উম্মে উমারা বর্ণনা করেন, আমি হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন মহানবী (সা.)-কে দেখছিলাম। তখন তিনি বসেছিলেন আর হযরত আব্বাদ বিন বিশর এবং হযরত সালামা বিন আসলাম (রা.) উভয়ে লৌহ শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। কুরাইশদের দূত সোহায়েল বিন আমর যখন নিজ কণ্ঠস্বর উঁচু করল তখন তারা উভয়ে তাকে বললেন যে, মহানবী (সা.) এর সামনে নিজের কণ্ঠস্বর নীচু রাখ বা মৃদু রাখ অথবা হালকা রাখ। (কিতাবুল মাগাযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৩, ২০০৪ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) এই উপলক্ষ্যে এটি তার এক বিশেষ সেবার উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হল, হযরত উকবা বিন উসমান (রা.)। হযরত উকবা বিন উসমান (রা.)-এর মায়ের নাম ছিল উম্মে জামীল বিনতে কুতবা। *(আত্ তাবাকাতুল কুবরা-ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০০, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

হযরত উকবা আনসারদের বনু যুরায়েক গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত উকবা এবং তার ভাই হযরত সাদ বিন উসমান (রা.) বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধের সময় আক্রমণের প্রচণ্ডতায় যে কয়েকজন সাময়িকভাবে পিছনে চলে যায় তাদের মাঝে দু'জন হযরত উকবা বিন উসমান এবং হযরত সাদ বিন উসমান (রা.)-ও ছিলেন। এমনকি তারা আহওয়াস এর বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি পাহাড় জালআবে পৌঁছে যান আর তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। আহওয়াস মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। এরপর তারা যখন উভয়ে মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে এ কথার উল্লেখ করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, **লাকাদ যাহাবতুম ফীহা আরীযাহ**। অর্থাৎ তোমরা সেদিকে গিয়েছ যেখানে ছিল প্রশস্ততা।

(উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৪-৫৫, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (জামেউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন, তাফসীরে তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৩-১৮৪ তফসীরাধীন আয়াত সূরা আলে ইমরান- ১৫৬, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (মু'জামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০ আ'ওয়াস শব্দ দ্রষ্টব্য)

যাহোক মহানবী (সা.) তাদের উপেক্ষা করেন এবং তাদের ভুলভ্রান্তি মার্জনা করে দিয়েছেন। কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হলো, আব্দুল্লাহ্ বিন সাহ্‌ল (রা.)। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সাহাল (রা.) বনু যাউরা গোত্রের সদস্য ছিলেন যা ছিল বনু আশহাল্ গোত্রের মিত্র। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি গাস্‌সানী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌র দাদার নাম কেউ যায়েদ এবং কেউ রাফেও বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌র মায়ের নাম ছিল সা'বা বিনতে তাইয়্যেহান, যিনি ছিলেন হযরত আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহান (রা.)-এর বোন। তিনি হযরত রাফে বিন সাহল (রা.)-এর ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার ভাই হযরত রাফে (রা.) তার সাথে ওহুদ ও পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। বনু ওয়ায়েফ গোত্রের এক ব্যক্তি তিরের আঘাতে তাকে শহীদ করেছিল। *(আস্ সীরাতুন্ নবুবিয়্যাহ্- ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৬৪, ২০০১ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) আত্ তাবাকাতুল কুবরা- ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬, ১৯৯৬ সনে বৈরুতে মুদ্রিত) (উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবা- ইবনে আসীর, পৃ. ২৬৯, ২০০৮ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)*

মুগীরা বিন হাকিম বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?

তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ আমি আকাবার বয়আতের সময়ও উপস্থিত ছিলাম। *(মাজমুয়ুয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বায়ুল ফাওয়ায়েদ লে আলী ইবনে আবি বকর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৮, কিতাবুল মাগাযি ওয়াস সিয়ার, বাব কাদ হাযারা বাদারা জামা'ত, হাদীস ১০০৪৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুতে ২০০১ সনে মুদ্রিত)*

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সাহাল (রা.) এবং হযরত রাফে বিন সাহাল (রা.) ভ্রাতৃদ্বয়, যারা বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন; তারা উভয়েই যখন ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন তারা মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন। তারা যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বেশি আহত ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় যখন মহানবী (সা.)-এর হামরাউল আসাদের অভিমুখে গমন এবং এতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হন তখন তাদের একজন অন্যজনকে বলেন, খোদার কসম! আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারি তাহলে এটি অনেক বড় একটি ক্ষতি হবে। আহত ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি আন্তরিক প্রেরণা ছিল, ঈমানের দৃঢ়তা ছিল।

হামরাউল আসাদ যা মদিনা থেকে ৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান (মু'জেমুল বিলদান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮১, হামরাউল আসাদ শব্দ) সেই যুদ্ধেও হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর অংশগ্রহণের উল্লেখ মহানবী (সা.)-এর জীবনী–সংক্রান্ত 'সোবুলুল হুদা' পুস্তকে এভাবে দেখা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সাহাল (রা.) এবং হযরত রাফে বিন সাহাল (রা.) ভ্রাতৃদ্বয়, যারা বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন; তারা উভয়েই যখন ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন তারা মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন। তারা যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বেশি আহত ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় যখন মহানবী (সা.)-এর হামরাউল আসাদের অভিমুখে গমন এবং এতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হন তখন তাদের একজন অন্যজনকে বলেন, খোদার কসম! আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারি তাহলে এটি অনেক বড় একটি ক্ষতি হবে। আহত ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি আন্তরিক প্রেরণা ছিল, ঈমানের দৃঢ়তা ছিল। অতঃপর বলেন, খোদার কসম! আমাদের কাছে কোন বাহনও নেই যাতে আমরা আরোহন করব আর আমরা এটিও জানি না যে, কীভাবে আমরা এ কাজ করব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, চল! আমরা পদব্রজে যাই। হযরত রাফে (রা.) বলেন, খোদার কসম! আঘাতের কারণে আমার চলার শক্তিও নেই। তার ভাই বলেন, চল আমরা ধীরে ধীরে হাঁটি আর মহানবী (সা.)-এর পানে অগ্রসর হই। তারা উভয়েই বহু কষ্টে যাত্রা করেন। হযরত রাফে (রা.) দুর্বলতা অনুভব করলে হযরত আব্দুল্লাহ্ রাফে (রা.)-কে পিঠে উঠিয়ে নেন, আবার কখনো তিনি পায়ে হেঁটে চলেন। অবস্থা এমন ছিল যে, দু'জনেই আহত ছিলেন কিন্তু যিনি তুলনামূলকভাবে ভালো ছিলেন তিনি বেশি আহতজনকে পিঠে উঠিয়ে নিতেন আর মহানবী (সা.)-এর পানে অগ্রসর হতে থাকেন। দুর্বলতার কারণে কোন কোন সময় অবস্থা এমন হতো যে, তারা

নড়াচড়াও করতে পারতেন না। এমনকি তারা উভয়েই এশার নামাযের সময় মহানবী (সা.)-এর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। সাহাবা (রা.) তখন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিলেন। তাঁরা একটি শিবির স্থাপন করেছিলেন। রাতের বেলা তাদের উভয়কে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থাপন করা হয়। সে রাতে মহানবী (সা.)-এর পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)। তারা উভয়ে যখন সেখানে পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন তোমাদের বিলম্বের কারণ কী? তারা এর কারণ কী ছিল তা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন। তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে গিয়ে বলেন, তোমরা যদি দীর্ঘজীবন লাভ কর তাহলে তোমরা তোমাদের বাহনস্বরূপ ঘোড়া, খচ্চর ও উটের মালিক হবে। এখন তোমরা কষ্টেসৃষ্টে পায়ে হেঁটে এসেছ ঠিক কিন্তু দীর্ঘজীবি হলে দেখতে পাবে এসব বাহনই তোমাদের নাগালে রয়েছে। অথচ একই সাথে তিনি (সা.) বলেন, কিন্তু তা তোমাদের এই সফর থেকে উত্তম হবে না যা তোমরা পদব্রজে কষ্টেসৃষ্টে করেছে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ ফি সীরাতিল খাইরিল ইবাদ লেমুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১০, আল বাবুর রাবে আশার ফি গাযওয়া হুমরাউল আসাদ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুতে ১৯৯৩ সনে মুদ্রিত) এর ফলে যে পুণ্য, প্রতিদান ও কল্যাণ লাভ করবে তা অনেক বেশি হবে।

হামরাউল আসাদ যুদ্ধ কী ছিল যাতে যোগদানের জন্য তারা মহানবী (সা.)-কে অনুসরণ করেছিলেন– এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। (তিনি লিখেন,) মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ওহুদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন এবং হামরাউল আসাদ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হল, মদীনার জন্য ওহুদের যুদ্ধ পরবর্তী রাত খুবই ভীতিপূর্ণ একটি রাত ছিল, কেননা কুরাইশ বাহিনী বাহ্যত মক্কার পথ ধরলেও শঙ্কা ছিল যে, এ কাজ তো আবার মুসলমানদের অপ্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে নয়? বাহ্যত তারা ওহুদের যুদ্ধ জয় করে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু মুসলমানদের মাঝে এ উৎকণ্ঠা ছিল যে, মদীনায় হামলার জন্য এটি আবার কোন প্রতারণা নয় তো, আকস্মিকভাবে ফিরে এসে আবার মদিনার ওপর আক্রমণ করবে না তো? এই সাবধানতা এবং সন্দেহের কারণে মদিনায় এ রাতে পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হয় আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সারা রাত বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর ঘরের পাহারা দেন।

প্রভাতে জানা যায়, এই সন্দেহ অলীক ছিল না; কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, কুরাইশ বাহিনী মদীনার কয়েক মাইল দূরে যাত্রা বিরতি দিয়েছে আর কুরাইশ নেতাদের মাঝে জোরালোভাবে এ বিতর্ক চলছে যে, এই বিজয়কে পুঁজি করে মদীনায় কেন হামলা করা হবে না। কতক কুরাইশ একে অপরকে ভর্ৎসনা করে বলছিল, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কেও হত্যা কর নি, মুসলমান নারীদের দাসীও বানাও নি আর তাদের ধনসম্পদও করতলগত কর নি, বরং তাদের বিরুদ্ধে যখন তোমরা বিজয়ী হলে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ পেলে তখন তোমরা তাদের এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলে যেন তারা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে!

তাই এখনো সুযোগ আছে, ফিরে যাও আর মদিনার ওপর হামলা করে মুসলমানদের নির্মূল করে দাও। পক্ষান্তরে অন্য কিছু লোক এটিও বলে যে, তোমাদের একটি বিজয় লাভ হয়েছে সেটিকে গণিমত জ্ঞান কর এবং মক্কায় ফিরে যাও। কোথাও এমনটি যেন না হয় যে, যে খ্যাতি তোমরা অর্জন করেছ তাও হাতছাড়া করে বস আর এই বিজয় আবার পরাজয়ে না পর্যবসিত হয়ে যায়। কেননা এখন যদি তোমরা ফিরে যাও আর মদিনায় হামলা কর তাহলে মুসলমানরা প্রাণান্তকর যুদ্ধ করবে আর যারা ওহুদে অংশগ্রহণ করে নি তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু অবশেষে উচ্ছ্বসিত লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি জয়যুক্ত হয় আর কুরাইশরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এসব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করেন, মুসলমানরা যেন প্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু একই সাথে এই নির্দেশও দেন যে, যারা ওহুদে অংশগ্রহণ করেছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ যেন আমাদের সাথে বের না হয়। অতএব ওহুদের মুজাহিদগণ, যাদের অধিকাংশ আহত ছিলেন, (দু'জনের কথা আমি উল্লেখ করেছি) তারা নিজেদের ক্ষতস্থান বেধে নিয়ে নিজেদের মনিবের সাথে যোগ দেন। লিখিত রয়েছে যে, এসময় মুসলমানরা এমন আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সাথে বের হয় যেভাবে কোন বিজয়ী বাহিনী বিজয়ের পর শত্রুকে ধাওয়া করার জন্য বের হয়। ৮ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি (সা.) হামরাউল আসাদ পৌঁছেন, সেখানে ময়দানে পড়ে থাকা দু'জন মুসলমানের লাশ তারা পান। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তারা ছিল গুপ্তচর, যাদেরকে মহানবী (সা.) কুরাইশদের পেছনে প্রেরণ করেন। কিন্তু কুরাইশরা সুযোগ পেয়ে তাদের হত্যা করে। মহানবী (সা.) একটি কবর খুঁড়িয়ে তাদেরকে একসাথে দাফন করিয়ে দেন। যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল তাই তিনি সেখানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং ময়দানের বিভিন্ন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে ও বিস্তীর্ণ জায়গায় আগুন জ্বালাতে বলেন। স্বল্পতম সময়ের ভেতর হামরাউল আসাদের ময়দানে ৫০০ স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে যা দূর থেকে অবলোকনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভীতসন্ত্রস্ত করত। এটি খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। লোকেরা মনে করে, এটি একটি জনবসতি। বড় বড় তাবু খাটানো রয়েছে। খুব সম্ভব তখনই খুযাআ গোত্রের মা'বাদ নামের এক পৌত্তলিক নেতা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ওহুদের যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে সমবেদনা প্রকাশ করে আর পুনরায় নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় দিন যখন সে মদিনার ৪০ মাইল দূরে রওহা নামক স্থানে

পৌঁছে তখন দেখে যে, কুরাইশ বাহিনী সেখানে শিবির স্থাপন করেছে, (যারা তর্ক-বিতর্কের পর মদিনায় ফিরে আসছিল) আর মদিনা অভিমুখে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। মা'বাদ ত্বরিৎ আবু সুফিয়ানের কাছে যায় আর তাকে গিয়ে বলে, তুমি কী করতে যাচ্ছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি এখনই মুহাম্মদ (সা.)-এর বাহিনীকে 'হামরাউল আসাদ'এ রেখে এসেছি। এমন প্রতাপান্বিত বাহিনী আমি কখনো দেখি নি, যারা ওহুদের পরাজয়ের গ্লানিতে (যে যুদ্ধ হেরেছিল তার গ্লানি) এতটা উত্তেজিত যে, তোমাদের দেখামাত্রই ভস্মীভূত করে ফেলবে, খেয়ে ফেলবে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আবু সুফিয়ান ও তার সাথীদের ওপর মা'বাদের এসব কথার এতটা ত্রাস সৃষ্টি হয় যে, তারা মদিনা অভিমুখে যাত্রার ধারণা পরিত্যাগ করে অনতিবিলম্বে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। মহানবী (সা.) এভাবে কুরাইশ বাহিনীর প্রস্থানের সংবাদ প্রাপ্ত হলে তিনি খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর বলেন, এটি খোদার প্রতাপ যা তিনি কাফিরদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন। এরপর তিনি আরো ২-৩ দিন 'হামরাউল আসাদ'-এ অবস্থান করেন এবং ৫ দিনের অনুপস্থিতির পর মদিনা ফিরে আসেন। *(সীরাত খাতামান্নাবীঈন এর ৫-৪-৫০৫ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত) (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৯,রওহা শব্দের ব্যাখ্যায়)*

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হল, হযরত উতবা বিন রাবিআ (রা.)। হযরত উতবা (রা.)'র সম্পর্ক কোন্ গোত্রের সাথে ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত উতবা বিন রাবিআ (রা.) বনু লওযান গোত্রের মিত্র ছিলেন আর তার সম্পর্ক ছিল বাহরা গোত্রের সাথে। কতকের মতে তিনি (রা.) আওস গোত্রের মিত্র ছিলেন। যাহোক, তিনি (রা.) বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমীরদের একজনের নাম উতবা বিন রাবিআ বলে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমার মতে ইনিই সেই সাহাবী। *(২০০১ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত আস্ সীরাতুন নবুবীয়াতুল হিশাম, পৃ: ৪৬৯) (১৯৯৬ সনে বৈরুত থেকে প্রকাশিত আত্ তাবাকাতুল কুবরা)*

ইয়ারমুকের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ হল, দ্বাদশ হিজরীতে হযরত আবু বকর (রা.) যখন হজ্জব্রত পালনের পর মদিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি (রা.) ত্রয়োদশ হিজরীর সূচনাতে মুসলমান বাহিনীকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যেমন: আমর বিন আস (রা.)-কে ফিলিস্তিন অভিমুখে (প্রেরণ করেন), ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান, হযরত আবু উবায়দা বিন আল-জাররাহ্ (রা.) ও হযরত শুরাহ্‌বিল বিন হাসানা (রা.)-কে সিরিয়ান মালভূমির বালকা হয়ে তবুকিয়া চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) প্রথমে হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন, যদিও পরে তার জায়গায় ইয়াযীদ বিন সুফিয়ানকে আমীর বানান। তারা ৭ হাজার মুজাহেদ-এর সাথে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। ইসলামী বাহিনীর আমীরগণ নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সিরিয়া পৌঁছেন। হেরাকেল নিজে হিমস্-এ আসে আর রোমানদের অনেক বড় বাহিনী প্রস্তুত করে। সে মুসলমান আমীরদের মোকাবিলার জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করে। শত্রুদের প্রস্তুতি দেখে মুসলমানদের ওপর ত্রাস ছেয়ে যা। আর তাদের কতক ততটা ঈমানদারও ছিল না, কেননা তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭,০০০। এমন পরিস্থিতিতে হযরত আমর বিন আস (রা.) নির্দেশ দেন যে, তোমরা সবাই একস্থানে সমবেত হয়ে যাও কেননা ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় তোমাদের সংখ্যা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের পরাজিত করা সহজ হবে না। অর্থাৎ বিরোধী বাহিনীর মোকাবিলায় তোমাদের সংখ্যা যদিওবা স্বল্প, কিন্তু যদি সমবেত হয়ে যাও তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে সহজে বিজয় লাভ হবে না। পৃথক পৃথক নেতার অধীনে যদি পৃথক অবস্থায় থাক তাহলে স্মরণ রেখ যে, তোমাদের মাঝে একজনও এমন অবশিষ্ট থাকবে না যে সম্মুখের কারো কোন কাজে আসতে পারে; কেননা আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে বড় বড় বাহিনী নিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতএব ইয়ারমুক নামক স্থানে সব মুসলমানের সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। হযরত আবুবকর (রা.)ও মুসলমানদের একই পরামর্শবাণী প্রেরণ করেন এবং বলেন যে, সমবেত হয়ে এক বাহিনীতে রূপ নাও আর নিজেদের বাহিনীকে মুশরেক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত কর। তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। আর আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী হন যারা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। তিনি তাকে লাঞ্ছিত করবেন যে তাঁকে অস্বীকার করেছে। তোমাদের মতো মানুষ সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হতে পার না। হযরত আবু বকর (রা.) সংবাদ প্রেরণ করেন যে, নিঃসন্দেহে তোমরা সংখ্যায় স্বল্প, কিন্তু যদি ঈমান থাকে এবং সম্মিলিতভাবে কাজ কর তাহলে কখনো তোমরা পরাজিত হতে পার না, কেননা তোমরা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যুদ্ধ করছ। তিনি বলেন, দশ হাজার বরং ততোধিক লোকও যদি পাপের সমর্থক হয়ে দণ্ডায়মান হয় তাহলে দশ হাজারের কাছে তারা অবশ্যই পরাজিত হবে। সংখ্যা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ো না, কেননা তোমরা যদি দশ হাজার হয়ে থাক বা এর চেয়েও বেশি হও, কিন্তু তারা যদি দুষ্কৃতকারী হয় এবং কুকর্মশীল হয় তাহলে অবশ্যই পরাজিত হবে। তাই তোমরা পাপ থেকে আত্মরক্ষা কর। নিজেদেরকে পবিত্র কর এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাও। একতা সৃষ্টি কর এবং ইয়ারমুক-এ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সমবেত হয়ে যাও। তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক আমীর নিজ নিজ বাহিনীর সাথে নামায আদায় করবে। হিজরী ১৩ সনের সফর মাস হতে রবীউস্ সানী মাস পর্যন্ত মুসলমানরা রোমান বাহিনীকে অবরোধ করে রাখে, যদিও

তখনও মুসলমানরা সফলতা পায় নি। তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রা.)-কে শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইরাক থেকে ইয়ারমুক পৌঁছার নির্দেশ দেন। হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রা.) তখন ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। হযরত খালেদ (রা.)-এর পৌঁছার পূর্বে সকল আমীর পৃথকভাবে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করছিল। তখন হযরত খালেদ (রা.) সেখানে পৌঁছে সকল মুসলমানকে একজন আমীর নির্ধারণ করার উপদেশ প্রদান করেন। এতে সবাই হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করে নেয়। রোমান সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা দুই লক্ষ বা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয় আর অপরদিকে মুসলমানদের বাহিনীর সংখ্যা ৩৭ হাজার থেকে ৪৬ হাজার পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়, অর্থাৎ (তারা) প্রায় এক পঞ্চমাংশ ছিল। রোমান বাহিনীর ক্ষমতার চিত্র হলো- আশি হাজারের পায়ে বেড়ি পরানো ছিল এবং চল্লিশ হাজার মানুষ শেকলাবদ্ধ ছিল যেন প্রাণ দেয়া ছাড়া পালানোর ধারণাও তাদের মাথায় না আসে। অর্থাৎ এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ এমন ছিল যাদেরকে এজন্য বেঁধে রাখা হয়েছিল যে, তারা শুধু যুদ্ধ করবে এবং মরবে, এছাড়া আর কোন পথ নেই এবং চল্লিশ হাজার মানুষ নিজেদেরকে নিজেদের পাগড়ির সাথে বেঁধে রেখেছিল এবং আশি হাজার অশ্বারোহী ও আশি হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। অসংখ্য পাদ্রি সৈন্যদের রণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রোমান সৈন্যদের সাথে ছিল। এই যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা.) জামাদিউল উলা মাসে অসুস্থ হন এবং জামাদিউল উখরা মাসে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ হযরত খালেদ এই যুদ্ধে মুসলমানদের বাহিনীকে অনেক ভাগে বিভক্ত করে দেন, যেগুলোর সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়, কিন্তু তারা এক আমীরের অধীনে যুদ্ধ করছিল। এসব উপদলের একটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন হযরত উতবা বিন রাবিআ (রা.)। হযরত খালেদ (রা.) বলেন, শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু আমাদের এই বিন্যাসের কারণে মুসলমানদের বাহিনী বাহ্যত শত্রুদের চোখে বেশি প্রতীয়মান হবে। ইসলামী সেনাবাহিনীর গুরুত্ব এ থেকে অনুমান করা যায় যে, (তাদের) প্রায় এক হাজার এমন বুযুর্গ বা জ্যেষ্ঠ সাহাবী এই সেনাবাহিনীতে ছিলেন যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র চেহারা দেখেছিলেন। একশত এমন সাহাবী ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উভয়পক্ষের মাঝে খুবই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখনই মদিনা থেকে এক দূত কোন সংবাদ নিয়ে আসে। ঘোড়ায় আরোহী সদস্যরা তার পথ রোধ করলে তিনি বলেন, সব ঠিক আছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যা ছিল তা হলো, সে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছিল। মানুষ এই দূতকে হযরত খালেদ (রা.) কাছে উপস্থিত করে এবং সে চুপিসারে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ দেয়। আর সৈন্যদেরকে যা বলেছে তা-ও বলে দেয় যে, আমি তাদেরকে কিছু বলি নি। হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রা.) তার কাছ থেকে পত্র নিয়ে নিজের তূণ-এ অর্থাৎ তির রাখার স্থানে রেখে দেন, কেননা তার আশঙ্কা ছিল যে, সৈন্যরা যদি এ সংবাদ অবগত হয় তাহলে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর ভয় আছে। মুসলমানরা হয়ত সেভাবে যুদ্ধ করবে না। যাহোক, মুসলমানরা অটল-অবিচল থাকে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চরম যুদ্ধ হয়। অবশেষে রোমান সৈন্যরা পুনরায় পলায়ন করতে আরম্ভ করে। এই যুদ্ধে এক লক্ষের অধিক রোমান সৈন্য নিহত হয় এবং মোট তিন হাজার মুসলমান এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এসব শহীদের মাঝে হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল (রা.)ও ছিলেন। কায়সার যখন এই পরাজয়ের সংবাদ লাভ করে তখন সে হিমস্-এ অবস্থান করছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বের হয়ে পালিয়ে যায়।

ইয়ারমুক বিজয়ের পর ইসলামী সেনাবাহিনী পুরো সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে আর কিন্নাসরীন, আন্তাকিয়া, জূমা, সারমীন, তিযীন, কূরুস, তাল্লে আযায, দুলুক, রা'বান ইত্যাদি স্থানে অতি সহজেই বিজয় লাভ করে। *(তারিখ আলতাবরি, খণ্ড: ০৪, পৃষ্ঠা: ৫৩-৬৩, দ্বারুল ফিকর, বৈরুত থেকে ২০০২ সনে প্রকাশিত সংস্করণ) (শাহ্ মুঈন উদ্দীন আহমদ নাদভী রচিত খুলাফায়ে রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুম, পৃষ্ঠা: ১২৬, রহমানিয়া কুতুবখানা লাহোর থেকে প্রকাশিত) (আলকামেল ফিত্তারিখ, খণ্ড: ০২, পৃষ্ঠা: ৩২৬, সুন্নত: ১৫, দ্বারুল কুতুবুল আরবী বৈরুত থেকে ২০১২ সনে প্রকাশিত সংস্করণ)*

আজ এ কয়জন সাহাবীরই স্মৃতিচারণ করার ছিল। এখন হয়ত রমজানের পরই পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে। আগামী সপ্তাহে রমজানও শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি একজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। জুমুআর নামাযের পর আমি একজন মরহুমের জানাযা পড়াব যা শ্রদ্ধেয়া সাহেবজাদী সাবিহা বেগম সাহেবার জানাযা। তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর দৌহিত্রী ছিলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার বড় মেয়ে ছিলেন এবং হযরত মির্যা রশীদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এবং হযরত উম্মে নাসের (রা.)-এর পুত্র সাহেবজাদা মির্যা আনোয়ার আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ৩০ এপ্রিল তারিখে তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ ৯০ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ এই সম্পর্কের দিক থেকে তিনি আমার মামী ছিলেন। হযরত মির্যা রশীদ আহমদ সাহেব হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। আর যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর সবচেয়ে বড় কন্যা আমতুস্ সালাম বেগম সাহেবার কন্যা ছিলেন তিনি। হযরত আম্মাজান (রা.) রাবওয়াতে স্বীয় পরিবারের যে বিয়েতে সর্বশেষ অংশগ্রহণ করেন তা তারই বিয়ে ছিল।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

চিকিৎসার কার্যকারিতা আল্লাহ্ তা'লার কৃপানির্ভর

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

রোগের উদ্ভব আর বিস্তার সৃষ্টিজগতের বৈশিষ্ট্যঃ

লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন পৃথিবীতে রোগাক্রান্ত হচ্ছে। যে কোন বড় হাসপাতালে গেলে রোগীর আধিক্য দেখে মনে হবে পৃথিবীর সব মানুষই বুঝি রোগাক্রান্ত। পাশ্চাত্য এবং বিশ্বের ধনী দেশগুলোতে উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু তৃতীয় বিশ্ব বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসা সেবার মান বেশ দুর্বল। ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ দরিদ্র আর চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা না থাকার কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে থাকে।

এসব দেশের হাসপাতালগুলোর বড্ড করুণ দশা, সেখানে মানুষ চিকিৎসার জন্য গেলেও আধুনিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে সঠিক চিকিৎসা পায় না। ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও হয়তো সময়মত ডাক্তার পাওয়া যায় না ফলে প্রয়োজনের সময় মানুষ সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়।

আরোগ্যলাভ আল্লাহ্ তা'লার দয়ার ওপর নির্ভরশীল:

লক্ষ লক্ষ এমন মানুষও আছে, যারা সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা পায় আর আরোগ্য লাভ করে। আবার অনেকে আছে যাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এলে যতই উন্নত চিকিৎসা করা হোক না কেন তারা নিয়তির কাছে হার মানতে বাধ্য। আবার অনেকে এমন আছে যারা নিজেদের ভুলের কারণে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। বাহ্যিকভাবে সুঠামদেহী এবং কমবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও এমন রোগ-ব্যাধির শিকার হয় যা ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, সব ধরনের চিকিৎসা এবং চেষ্টা-তদবীর করা সত্ত্বেও তারা প্রাণে বাঁচতে পারে না।

কিন্তু, পৃথিবীতে এমনও অনেক মানুষ আছে যাদের চিকিৎসা করানোর মতো সাধ্য বা সামর্থ কোনটিই নেই। অনেক ক্ষেত্রে, রোগীর বেঁচে থাকার মতো কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে না হলেও খোদা তা'লার দয়ায় তারা বেঁচে যায়। এথেকে প্রমাণ হয় যে, মানুষ যত চেষ্টাই করুক না কেন খোদার কৃপা না হলে কেউ আরোগ্য লাভ করতে পারে না। আর খোদার দয়া হলে বিনা চিকিৎসায়ও মানুষ পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে উঠে।

রোগ নিরাময়ের চিকিৎসাপদ্ধতি উদ্ভাবন আল্লাহ্ তা'লারই বিশেষ অনুগ্রহঃ

মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীস এবং তাঁর সত্যিকার প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী থেকে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে খোদার দয়া এবং অনুগ্রহেই যে

মানুষ আরোগ্য লাভ করে তেমনই কতক ঘটনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে 'শাফী' বা আরোগ্যদাতা। কেবল মানুষই নয় বরং সকল প্রাণী, জীব-জন্তু এবং পশুপাখি ও জড়জগত সব কিছুরই নিরাময়দাতা তিনি। বর্তমানে মানুষ গবেষণা করে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ'-এর বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি নির্ণয়ের চেষ্টা করে থাকে আর সে প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ খোদা তা'লা তাদেরকে চিকিৎসা পদ্ধতি শিখান।

চিকিৎসায় সাফল্যলাভে বড়াই করা অনুচিত:

খোদা তা'লা মানুষকে ব্যাধিমুক্ত করতে এ জগতে কতই না আয়োজন করেছেন। বরং আল্লাহ্ তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সেবায়ও মানুষকেই নিয়োজিত করেছেন। বিভিন্ন দেশে প্রাণী জগতের চিকিৎসা এবং তাদের সেবার পিছনে বেশ বড় অংক ব্যয় করা হয়ে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন রোগের নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কৃত হচ্ছে, অস্ত্রপচারের অত্যাধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত হচ্ছে। এসব চিকিৎসা এবং অপারেশনের ফলে মানুষ আশানুরূপ আরোগ্যও লাভ করছে। এই সফলতার মূল কারণ হচ্ছে খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির সফল প্রয়োগ। উন্নত বিশ্বে, বর্তমানে আরোগ্যের হার যে মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্বকালে কোন ক্রমেই এটি সম্ভব ছিল না। তারপরও আল্লাহ্ তা'লা মানুষের সামনে একটি বিষয় সুস্পষ্ট করে থাকেন যে, সত্যিকার 'শাফী' বা আরোগ্যদাতা তিনিই। অনেক সময় চিকিৎসকরা চিকিৎসা সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও রোগী মারা যায়। তাই এ ব্যাপারে ডাক্তারদের দৃষ্টি রাখা উচিত, কোন প্রকারেই যেন নিজের বড়াই প্রকাশ না পায়।

রোগের কষ্ট থেকে পরিত্রাণদাতা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা:

মহানবী (সা.) বলেন, 'রোগের কষ্ট থেকে মূলতঃ আল্লাহ্ তা'লাই মুক্তি দিয়ে থাকেন।'

খোদার পুণ্যবান বান্দারা খোদার আসনে কাউকে বসান না, তারা খোদা তা'লার পবিত্র সত্ত্বার জন্য গভীর আত্মভিমান রাখেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনে এমন অগণিত ঘটনার প্রমান পাওয়া যায়।

হযরত মুনশী জাফর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, "হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাথা চক্কর দিত। তাঁকে জানানো হয় যে, এমন একজন আছেন যিনি এর চিকিৎসায় পারদর্শী। অনেক দূর থেকে সেই চিকিৎসককে আনানো হল। চিকিৎসক হযরত (আ.)-কে দেখে বললেন, 'দু'দিনেই আমি আপনাকে ঠিক করে দিব।'

একথা শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গৃহাভ্যন্তরে চলে যান এবং হযরত মৌলভী হেকীম নূরউদ্দিন (রা.)-কে চিরকুট লিখে পাঠান যে, 'আমি এ ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণ করতে কোনক্রমেই প্রস্তুত নই, কেননা সে খোদা হবার দাবী করছে'। এরপর যাতায়াত ভাড়া এবং অতিরিক্ত ২৫ টাকা দিয়ে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হল।"

এই হল তাদের রীতি, খোদার প্রতি যারা পূর্ণরূপে সমর্পিত এবং খোদার সত্ত্বার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তারা সর্বদা খোদার প্রতিই ভরসা করেন কোন মতেই চিকিৎসকের প্রতি নয়। বর্তমান যুগ এমন যে, নিত্যদিন কোন না কোন আবিষ্কারাদি সামনে আসছে। আবিষ্কৃত হয়েছে লাইফ-সাপোর্ট মেশিন। যা দ্বারা কৃত্রিমভাবে একজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কয়েক বছর পূর্বে একথা চিন্তাও করা যেতো না। যেসব ব্যাধিকে পূর্বে দূরারোগ্য ব্যাধি মনে করা হতো আজ তার সফল চিকিৎসা হচ্ছে। তাই বলে মানুষের, নিজেকে খোদা মনে করা উচিত নয়! কেননা জ্ঞানের আসল উৎস হলেন খোদা তা'লা। তিনিই মানুষকে সেই জ্ঞান দান করেছেন যা তাদের পূর্ববর্তীদের ছিল না। তাই আসল 'শাফী' বা আরোগ্যদাতা তিনিই। মানুষ একজন সহমর্মী মাত্র; এর চেয়ে বেশি সে কিছুই করতে পারে না।

চিকিৎসকদের উচিত রোগীদের মনোযোগ দোয়ার প্রতি নিবদ্ধ করা:

প্রত্যেক ডাক্তার এবং গবেষকের উচিত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের চিকিৎসা করা এবং তাদের কষ্ট লাঘব করার সম্ভাব্য সকল উদ্যোগ নেয়া। অমুসলিমরা এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও আহমদীদের উচিত এর প্রতি মনোযোগ দেয়া। রাবওয়া এবং আফ্রিকায় আহমদী ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন'-এর উপর 'হুওয়াশ্ শাফী' (আল্লাহ্'ই আরোগ্যদাতা) লিখে থাকে, এর অনুবাদ লিখে দিলে আরো ভালো হয়। অধিকাংশ পুরোনো আহমদী ডাক্তারই এটি লিখে থাকে কিন্তু নতুন প্রজন্মের ডাক্তারদেরও এ অভ্যাস রপ্ত করা উচিত। সবার মাথায় এটি থাকা চাই যে, খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই মানুষের চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু আরোগ্যলাভ কেবল আল্লাহ্ চাইলেই হয়। চিকিৎসকের মন-মানসিকতা যদি এমন হয় তাহলে রোগীদেরও দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

অনুরূপভাবে রোগীদেরও এটি বলা কোন ক্রমেই সমীচীন নয় যে, অমুক ডাক্তার চিকিৎসা করলে বা তমুক হাসপাতালে আমার চিকিৎসা হলেই আমি সুস্থ্য হয়ে যাব বরং তার দোয়া করা উচিত।

আল্লাহ্'র ফযলে প্রতিদিন খলীফাতুল মসীহ্'র কাছে যে হারে আহমদীদের পক্ষ থেকে দোয়ার চিঠি আসে তাতে এটাই মনে হয় যে, খোদার প্রতি আহমদীদের প্রবল ভরসা আছে। কিন্তু যারা বলেন যে, অমুক ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নিলেই আমি আরোগ্য লাভ করব, তারা এক ধরণের অংশীবাদীতায় প্রচ্ছন্নভাবে লিপ্ত।

আল্লাহ্'র জন্য তাঁর বান্দাদের আত্মাভিমানের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্তঃ

এ পর্যায়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বোনের একটি ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে।

'একবার হযরত মৌলভী হেকীম নূরউদ্দীন (রা.)-এর এক ভাগ্নে 'ভেরা'-তে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এর কিছুদিন পর তিনি (রা.) গ্রামে আসেন এবং তার চিকিৎসায় একজন আমাশয়'-এর রোগী আরোগ্য লাভ করলে তাঁর বড় বোন বলেন, 'তুমি যদি এখানে থাকতে তাহলে আমার সন্তানটি আমাশয় আক্রান্ত হয়ে মারা যেতো না'। বোনের কথা শুনে হযরত মৌলভী সাহেব বলেন, 'তোমার আরেকটি ছেলে হবে এবং সেও আমাশয় আক্তান্ত হবে আর আমি চিকিৎসা করা সত্ত্বেও সে মারা যাবে কিন্তু এরপর খোদা তোমাকে আরও এক সন্তান দান করবেন'। বাস্তবে সেভাবেই ঘটনা ঘটে যেভাবে তিনি বলেছিলেন। পরে সে অনুযায়ীই খুবই সুদর্শন আরেকটি ছেলেসন্তান জন্ম নেয় এবং সে দীর্ঘজীবন লাভ করে।'

খোদার জন্য, হাজীউল হারামাঈন হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) সাহেবের এমনই আত্মাভিমান ছিল ।

হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল (রা.) সাহেবের এমনই একটি ঘটনা রয়েছে :-

তিনি ১৯০৭ সালে লাহোর মিউ হাসপাতালের হাউস-সার্জন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বড় শ্যালিকা, বোনের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন এবং একমাস তাঁর কাছে অবস্থান করেন। ঐ মহিলা কেবল তাঁর শ্যালিকাই নন বরং তাঁর ফুপাতো বোনও ছিলেন। সেই ফুপাতো বোনের একটি কন্যাসন্তান হয়ে কিছুদিন পরই মারা যায় আর মেয়ের মৃত্যুশোক ভোলার জন্যই তিনি বোনের বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। এখানে এসে বারবার একটি কথাই বলতে থাকেন যে, 'আমার বোন-জামাই সেখানে থাকলে আমার মেয়েটি মারা যেতো না'।

সে বারংবার একই কথা বলতে থাকলে খোদা সম্পর্কে ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের হৃদয়ে আত্মাভিমান জাগ্রত হয়। ডাক্তার সাহেব তাকে বললেন যে, 'আপনার ঘরে আরেকটি ছেলে-সন্তানের জন্ম হবে এবং আমার চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও সে মারা যাবে'। বাস্তবে দীর্ঘকাল পরে তার ঘরে একটি ছেলে-সন্তান জন্ম লাভ করে এবং ছেলেকে সাথে নিয়ে তিনি পুনরায় বোনের বাড়ীতে বেড়াতে আসেন, পথিমধ্যে ফ্লাস্কে রাখা গরম দুধ ফেটে যায় আর শিশুবাচ্চাকে তাই পান করানো হলে বাচ্চাটি মারাত্মকভাবে পেটের পীড়ায় আক্তান্ত হয়। বাচ্চার সব ধরনের চিকিৎসা তারা করান, হযরত মীর সাহেব নিজেও চিকিৎসা করেন আর অন্য ডাক্তার দিয়েও চিকিৎসা করানো হয় কিন্তু দু'মাস রোগভোগের পর শিশুটি মারা যায়।

মীর সাহেব বলেন, 'ছয় বছর পূর্বে তার অংশীবাদীতা দূর করার জন্য আমি যে কথা বলেছিলাম তা আমার মনে পড়ে আর বাস্তবেও আমি চিকিৎসা করা সত্ত্বেও সেই ছেলেটি মারা যায়'।

মহান ব্যক্তিরা নিজেরাও প্রচ্ছন্ন অংশীবাদীতা থেকে এমনইভাবে মুক্ত থাকতেন এবং অন্যদেরকেও মুক্ত রাখতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁর পুণ্যবান সাহাবীদের গুণাবলীতে এমনই ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করেছিল।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্'র কৃপাতেই রোগ-ব্যাধি দূরীভূত হতে পারে। খোদা তা'লা সকল রোগের চিকিৎসা বা ঔষধ রেখেছেন আর মানুষ খোদার সৃষ্ট উপকরণই চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করে। বিভিন্ন গুল্মলতা, পোকা-মাকড় এবং সাপের বিষ থেকেও ঔষধ বা প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয়। এটি সৃষ্টিজগতের প্রতি খোদার একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি ঔষধের পাশাপাশি মানুষকে তা সেবনবিধির জ্ঞান দিয়ে তাদেরকে ব্যবহার করার পদ্ধতিও শিখিয়েছেন।

মধুর রয়েছে আরোগ্যপ্রদায়ী বৈশিষ্ট্যঃ

যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা 'মধু'-র কথা উল্লেখ করে বলেছেন, লিন্নাসে শিফাউ' অর্থাৎ 'মানুষের জন্য এতে আরোগ্য নিহিত আছে'। মুসলমানরা মধুর গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও অমুসলমানরা ঠিকই এর উপকারীতা ও গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তারা মধু-মিশ্রন থেকে ঔষধিগুণ সম্পন্ন বিভিন্ন নির্যাস প্রস্তুত করে, যা অত্যন্ত উপকারী। একইভাবে রয়েছে 'রয়েল-জেলি' যা মানুষের জন্য খুবই উপকারী। এমন এমন ঔষধ এথেকে প্রস্তুত করা হচ্ছে যা বিভিন্ন রোগ বা দুরারোগ্য ক্ষত নিরাময়ে উত্তম ফল প্রদান করছে। প্রসঙ্গক্রমে, এখানে একটি কথা, মৌচাকে এক ধরনের পোকার আক্রমন হয়ে থাকে যদিও মৌচাক নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা স্বয়ং মৌচাকেই রয়েছে। মৌমাছি উড়াল শেষে যখন ফিরে এসে মৌচাকে বসে তখন সেখানে একটি পাপোশের মত আছে যার উপর বসে প্রথমে সেখানে মৌমাছি পা মুছে তারপর নির্ধারিত কোঠরে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রকৃতিগত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মৌচাক এবং মৌমাছির জীবন মাঝে-মধ্যে হুমকির মুখে পড়লে মৌ-চাষীরা প্রচণ্ডভাবে চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হয়, কারণ এমনটি হলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মধু ও মৌমাছি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু এমন শঙ্কাজনক অবস্থা কোনভাবেই হবে না, কারণ পবিত্র কুরআন একটি স্থায়ী ঐশীগ্রন্থ এবং এর শিক্ষাও স্থায়ী, তাই এতে বর্ণিত বিষয়ও স্থায়ীভাবে থাকবে। তবে, খোদা তা'লা বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রতি চরম অবিশ্বাস এবং আস্থাহীনতার ফলে শাস্তিস্বরূপ যদি কোন স্থান থেকে এই নিয়ামত উঠিয়ে নিতে চান তাহলে ভিন্ন কথা। তাই মৌমাছি নিয়ে গবেষণা করা উচিত। আহমদীদের দ্রুত এ গবেষণার ময়দানে প্রবেশ করা উচিত কেননা এ ক্ষেত্রটি খুব দ্রুত খালি হচ্ছে। গবেষণায় নিয়োজিত হলে আহমদীরা নিজেরাও উন্নতি করবে এবং সমাজেও প্রতিষ্ঠা পাবে আর স্বদেশেরও সেবা করতে পারবে।

মধু ব্যবহারে আরোগ্যলাভের কয়েকটি উদাহরণঃ

এবারে কয়েকটি হাদীসের আলোকে মধু দ্বারা চিকিৎসা এবং মহানবী (সা.)-এর দোয়ার অলৌকিক নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন সাহাবীর আরোগ্যলাভের কথা তুলে ধরা হচ্ছে।

হযরত সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার আমি অসুস্থ্য হয়ে পড়লে মহানবী (সা:) আমাকে দেখতে আসেন। তিনি (সা.) তাঁর নিজ হাত আমার বুকের উপর রাখেন। এক পর্যায়ে আমি তাঁর হাতের শীতলতার পরশ আমার হৃদয়ে অনুভব করছিলাম। তারপর তিনি (সা.) বলেন, 'তোমার হৃদরোগ হয়েছে; তুমি সাকীফ গোত্রের হালীফ হারেস বিন কালদাহ্'র কাছে যাও, কেননা সে একজন চিকিৎসক। তাকে বল, সাতটি আজওয়া খেজুর (খেজুরের এক বিশেষ প্রজাতি) বিচিসহ পিষে তা দিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করে তোমার মুখে দিতে'।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক বর্ণনায় বলেন যে, 'তিনি (সা.) বলেছেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে আরোগ্য আছে। (১) মধুর ফোটা (২) অস্ত্রপচার (৩) আগুনের ছ্যাঁক দেয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুনের ছ্যাঁক দিতে বারণ করছি।'

হযরত খালেদ বিন সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, "আমরা সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই, গালেব বিন আবজরও আমাদের সাথে ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন এবং যখন আমরা মদীনা পৌঁছি তখনও তিনি অসুস্থ্যই ছিলেন। ইবনে আবী আতীক তাকে দেখার জন্য আসেন এবং তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের 'কালোজিরা' ব্যবহার করা উচিত। এর পাঁচ-সাতটি দানা পিষে, তা তেলের সাথে মিশিয়ে ফোটা ফোটা করে তার নাকে ঢালতে থাকো। উভয় নাকেই দিতে থাকো। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, কালোজিরায় 'সাম' ছাড়া সকল প্রকার রোগ-ব্যাধির আরোগ্য রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করেন 'সাম' কাকে বলে, তিনি (সা.) বলেন, 'মৃত্যু'।"

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, মাশরুমের পানি চোখের জন্য আরোগ্যের কারণ।'

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'নবী করীম (সা.) বলেছেন, জ্বর হচ্ছে জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; তাই তোমরা পানি দ্বারা তা নির্বাপিত করো।'

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'মহানবী (সা.) তাঁর পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করতেন। ডান হাতে তাদের স্পর্শ করে বলতেন:

আল্লাহুম্মা রাব্বান্নাসি আযাহি বিন্নাসাশ্‌ফিহি ওয়া আন্‌তাশ্‌শাফী লা শিফাআ' ইল্লা শিফাউ'কা শিফাআন্ লা ইউগাদিরু সাক্বামান্।

অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ্! মানুষের প্রভু-প্রতিপালক, রোগ-ব্যাধি দূর করে দাও। তুমি একে আরোগ্য দাও কেননা তুমিই আরোগ্যদাতা। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমনভাবে আরোগ্য দাও যাতে রোগের নাম-গন্ধও না থাকে।'

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কারো থালায় মাছি পড়লে মাছিকে পুরোপুরি থালায় ডুবিয়ে এরপর ফেলে দিবে কেননা এর একটি ডানায় আরোগ্য এবং অন্যটিতে ব্যাধি রয়েছে।'

এ বিষয়টি আজ জাপানের গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে, মাছি এক ডানায় জীবানু এবং অন্য ডানায় জীবানু প্রতিষেধক বহন করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, "একজন মহিলা তার ছেলেকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্'র রসূল! এই ছেলেটি পাগল আর যখন আমরা খেতে বসি তখনই ওর পাগলামী বেড়ে যায় আর ও' আমাদের খাবার-দাবার সব নষ্ট করে ফেলে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই ছেলের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। ছেলেটি বমি করে এবং তার মুখ দিয়ে কালো রঙ'-এর কোন পদার্থ বের হয়ে আসে এরপর সে হাটতে আরম্ভ করে বা পুরোপুরি ভালো হয়ে যায়।"

ইয়াযিদ বিন আবি উবাইদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, "আমি হযরত সালমাহ্ (রা.)-এর পায়ের গোছায় ক্ষত দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করি 'হে আবু মুসলিম! এটি কি ভাবে হল'? তিনি উত্তরে বলেন, 'খয়বরের যুদ্ধে আমি এখানে আঘাত পেয়েছিলাম। মানুষ বলতে থাকে যে, হযরত সালমাহ্ আহত হয়েছে। আমি নবী করীম (সা.)-এর কাছে এলে তিনি (সা.) সেই ক্ষতের উপর তিন বার ফুঁ দেন। এরপর থেকে এ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন কষ্টই আমার হয় নি'।"

হাদীসে চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে যা বর্ণিত হয়েছে তার সার কথা হল :

'প্রকৃত চিকিৎসক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'লা কিন্তু তুমি একজন সহানুভূতিশীল মানুষ মাত্র। এই রোগের আরোগ্যদাতা হচ্ছেন সেই সত্ত্বা যিনি একে সৃষ্টি করেছেন।'

'তোমরা সদকা প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসাকে ত্বরান্বিত কর এবং যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের ধন-সম্পদকে পবিত্র কর।'

এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সময়কার কতিপয় ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখ করা হচ্ছে যাতে তাঁর (আ.) দোয়ার বদৌলতে অলৌকিকভাবে বিভিন্ন মানুষ আরোগ্য লাভ করেছেন বলে জানা যায়। নিচে তা থেকে দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে:-

হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) বলেন, '১৯০৪ সনে একবার হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব মারাত্মকভাবে অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। অসুস্থাবস্থায় তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, তাঁর স্ত্রী মনে করেছিলেন যে, এটি তাঁর জীবনের অন্তিম মূহুর্ত। তিনি কাঁদতে কাঁদতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। হুযূর (আ.) সামান্য পরিমান কস্তুরী দিয়ে বলেন, উনাকে খাইয়ে দিন আর আমি দোয়া করছি। একথা বলে তখনই তিনি অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যান, সময় ছিল সকাল বেলা। হযরত মুফতী সাহেবকে কস্তুরী খাইয়ে দেয়ার পর তিনি আরাম বোধ করেন আর অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ্য হয়ে উঠেন।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং বলেন, 'মালির কোটলার সম্ভ্রান্ত সরদার নওয়াব মোহাম্মদ আলী খাঁন সাহেব'-এর ছেলে আব্দুর রহীম খাঁন প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং তার বাঁচার কোন আশাই ছিল না বরং মৃতবৎ পড়েছিল। সে সময় আমি তার জন্য দোয়া করি, জানা যায় যে, তকদীরে মুবরাম (অটল তকদির)-এর মত বিষয়, তখন আমি খোদার দরবারে নিবেদন করি যে, হে মা'বুদ! আমি এর জন্য শাফায়াত করছি। এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

মানযাল্লাযি ইয়াশ্‌ফাউ' ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহী

অর্থাৎ, এমন কে আছে! যে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে? তৎক্ষণাৎ আমি চুপ হয়ে যাই। এরপর অনতিবিলম্বে ইলহাম হয়-

ইন্নাকা আনতাল মিজায

অর্থাৎ, তোমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে, আমি পরম অনুনয়-বিনয়ের সাথে আবার দোয়া আরম্ভ করি এবং খোদা তা'লা আমার দোয়া কবুল করেন এবং সেই ছেলে মনে হল যেন কবর থেকে বেরিয়ে এলো এবং স্বাস্থ্য ভালো হবার লক্ষণ দেখা গেল, এত বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, দীর্ঘদিন লেগেছে তার আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে, পরিশেষে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে এবং এখনও জীবিত আছে।'

সুতরাং আসল বিষয় হচ্ছে খোদার সত্ত্বায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস, কেননা তিনিই 'শাফী' বা পূর্ণ আরোগ্যদাতা। চিকিৎসা কেবল তখনই কাজে আসে যখন এতে আল্লাহ্'র ইচ্ছা শামিল হয়। হাদীসে এসেছে ঔষধ একটি উসীলা মাত্র, মূলত আল্লাহ্'র ইচ্ছাতেই মানুষ রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) খোদার মাহাত্ম বর্ণনা এবং তাঁর ফযল ও কৃপার উল্লেখ করে বলেন,

ওয়া ইযা মারিযতু ফাহুওয়া ইয়াশ্‌ফিনী

অর্থাৎ: এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।' (সূরা আশ্ শো'আরা: ৮১)

'এখানে আমি পীড়িত হই' বলে সেদিকেই ইশারা করেছেন যে, অনেক সময় মানুষ নিজের ভুলের কারণে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। মানুষের ভুলের কারণে সে খোদার হাতে ধরা পড়ে এবং খোদার 'নির্ধারিত তকদীর' প্রকাশ পায়। তাই হযরত ইব্রাহীম (আ.) বলেছেন, যখন আমি অসুস্থ্য হয়ে পড়ি তখন খোদা তা'লা আমাকে আরোগ্য দেন।

সুতরাং যদি আল্লাহ্ ফযল করেন তাহলেই মানুষ আরোগ্য লাভ করতে পারে নতুবা নয়। এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আ.) বলেছেন, আমি আমার ভুলের কারণে রোগাক্রান্ত হই এবং আমার খোদা তাঁর কৃপা দ্বারা আমাকে আরোগ্য দান করেন। বর্তমান যুগে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ঔষধ আল্লাহ্'রই ফযলে আমরা পাচ্ছি, এসব ঔষধ ব্যবহারের পর খোদার ফযলেই আমরা আরোগ্য লাভ করে থাকি।

ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেতে বুদ্ধিমানরা আল্লাহ্ তা'লারই দ্বারে সেজদাপ্রণত হয়ে থাকেঃ

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা তাদের আধ্যাত্মিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের আত্মিক উন্নতি, খোদার নৈকট্য এবং আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত করার জন্য খোদা তা'লা যুগে যুগে নবী রসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে এটি তাকে খোদার সমীপে আরো সমর্পিত হতে উদ্বুদ্ধ করবে, সে বুঝতে পারবে যে খোদা তা'লা তার শারীরিক, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময়ের মাধ্যমে তার আত্মিক উন্নতি বিধান করেছেন।

তাই এ সবকিছু থেকে লাভবান হবার জন্য খোদার ফযলকে আকর্ষণ করা চাই আর খোদার সম্মুখে পূর্ণরূপে সমর্পিত হবার ফলেই তা লাভ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের দোয়া শ্রবণ করে আপন শাফী বা আরোগ্যদাতা হবার প্রমানস্বরূপ তাঁর বান্দাদের আরোগ্য দান করেন। তাই মু'মিনের জীবনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, ওয়াকিবহাল থাকা। আল্লাহ্ করুন, আমরা সবাই যেন তাঁর অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলীর অভিজ্ঞান লাভে সক্ষম হই আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়াসমূহ কবুল করে আমাদের মধ্যে যারা পীড়িত তাদের সবাইকে আরোগ্য দান করুন, আমীন। *(খুতবাতে মসরুর ২০০৮ অবলম্বনে)*

খেলাফতের কল্যাণ

(বাংলাদেশের ৯৬তম জলসা সালানায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, মুরুব্বি সিলসিলাহ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অনুবাদ: তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী। *(সূরা আন্ নূর: ৫৬)*

জগতের ছোট অনু-পরমানু থেকে শুরু করে এটম পর্যন্ত, এমনকি মানবদেহ, যার-ই বক্ষ বিদীর্ণ করবেন, সেখানেই এক গতিশীল হৃদয়, এক কেন্দ্র দেখতে পাবেন যা সেই অনু-পরমানু বা মানবদেহের চলাচল নিয়ন্ত্রন করছে। এমনিভাবে বিশ্ব জগতের প্রত্যেকটি জিনিসের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। মানবীয় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হৃদয়ের ইশারায় গতিশীল হয়। তেমনি মহা বিশ্বের সকল গ্রহ-নক্ষত্র নিজস্ব এক কেন্দ্রকে ঘিরে অবর্তিত হচ্ছে। কয়েকটি গ্রহ মিলে এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে যার কেন্দ্রস্থল হল সূর্য। আর অনেকগুলো সৌর জগত মিলে একটি গ্যালাক্সি এবং অনেকগুলো গ্যালাক্সি একটি কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে।

এই যে কেন্দ্রের দিকে সবার মনোযোগ বা কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হওয়া, এটি এক দিকে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের শিক্ষা দেয়, অপরদিকে মানব জাতির জন্য এর মাঝে এক বিরাট শিক্ষা বিদ্যমান অর্থাৎ জগতের কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা ছাড়া অপরিপূর্ণ। জগতের সকল উন্নতি কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল।

মানব সমাজেও দেখবেন, সেখানেও এক নেযাম আছে, জগতের প্রত্যেক এলাকায়, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক গোত্রে এটি আছে আর সর্বত্র এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা থাকা প্রমাণ বহন করে যে, এটি মানবীয় স্বভাবের অন্তর্গত। কিন্তু জাগতিক এসব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, আর এতেই প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো ঐশী নেযাম নয়। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র ঐশী হাতের ইশারায় চলছে না।

অপর দিকে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হল, মানুষ যেন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। নিশ্চিন্তে এ জগতে বসবাস করতে পারে। এই দৃষ্টিকোন থেকে জাগতিক ব্যবস্থাপনাগুলোকে আমরা যখন দেখি, তখন আমাদের হৃদয়ে যে প্রশ্ন জাগে, তার উত্তর আমরা পবিত্র কুরআনে দেখতে পাই।

পবিত্র কুরআনের সূরা আন্ নূরের ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের মাঝে ঠিক সেভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, যেভাবে পূর্ববর্তীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন: "হযরত মূসা (আ.) তার উদ্দেশ্য বা মিশন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খলিফা নবীর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। যেমন বাইবেলে লেখা আছে,

"যখন পরমেশ্বর প্রভুর পবিত্র বান্দা মারা গেলেন তখন পরমেশ্বর প্রভু নুনের পুত্র যশুয়াকে যিনি মূসার সেবক ছিলেন তাকে সম্বোধন করে বললেন যে, আমার দাস মূসা মারা গিয়েছে, অতএব তুমি উঠ এবং এই জর্ডান নদী পার হয়ে এই জাতিকে সাথে নিয়ে সেই পবিত্র নগরী যার প্রতিশ্রুতি আমি বনি ইসরাইলদেরকে দিয়েছি, সেখানে যাও। পুরো পবিত্র নগরী এবং যে মহাসগর সূর্য অস্ত যাওয়ার অভিমুখে, সেই অবধি তোমাদের সীমারেখা হবে। আমি তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না এবং তোমাকে কখনোই অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেব না। অতএব দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও এবং সাহসিকতা প্রদর্শন কর।

সেই অনুযায়ী হযরত যশুয়া পূর্ণ সাহস ও বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং পরিশেষে তার বিজয় লাভ হয় আর জর্দান নদীর ওপারের এলাকা অর্থাৎ পবিত্র নগরী তারা লাভ করেন। তাই বিষয়টি স্পষ্ট যে, বনি ইসরাইলদের এই বিজয় এবং মূসা আলাইহিস সালামের অসমাপ্ত পরিকল্পনা শুধুমাত্র এই কারণে পূর্ণতা পেয়েছিল যে, মূসার জাতি খেলাফত ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করেছিল এবং এই খেলাফতের আনুগত্যে তারা আত্মবিসর্জন দিয়েছিল। আর এভাবেই ধর্মের প্রতিষ্ঠার ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল।

এখন চলুন, খেলাফত বিষয়টি নিয়ে একটু বিশ্লেষনে যাওয়া যাক। খেলাফত হল নবুওয়্যতের স্থলাভিষিক্ত আর খলিফা নবীর জারিকৃত মহান মিশন খোদার পক্ষ থেকে

পথপ্রদর্শিত হয়ে নবী প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয় এবং নবীর আগমনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য নব নব উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে আর এভাবেই তিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করেন আর তিনি নিজ আবশ্যকীয় দায়িত্ব অতি আবেগের সাথে দ্রুত সম্পাদনকারীকে খলীফা বলা হয়।

ভেবে দেখুন, আজ খেলাফতের পতাকাতলে না থাকার কারণে মুসলিম বিশ্বে অশান্তি আর অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছে। পবিত্র কুরআনের ন্যায় এমন পরিপূর্ণ জীবন বিধান থাকা সত্বেও আজ মুসলিম বিশ্ব শতধা বিভক্ত। এর মূল কারণ হল, তাদের কাছে এমন কোন ঐশী নেযাম নেই যার আনুগত্য করা প্রত্যেক সদস্যের জন্য ফরজ। আজ যদি বিশ্ব ইসলাম এমন এক নেযামের তথা ঐশী ব্যবস্থাপনার অধীনে এসে যায়, তাহলে মুসলমানরাই পৃথিবীর পরাশক্তিতে পরিনত হতে পারে। প্রকৃত বিষয় হল, বিশ্ব ইসলামের উন্নতি, ঐক্য খেলাফত ছাড়া একেবারে অসম্ভব।

বিখ্যাত আলেম আশ শায়খ তানতাভী আল জোহারীও এ কথা স্বীকার করেছেন এবং আয়াতে এস্তেখলাফ লিপিবদ্ধ করার পর তিনি লিখেছেন–

"এই আয়াত আমি পুনরায় আমার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করছি আর মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির পদ্ধতি বর্ণনা করার পর আমি পুনরায় এই আয়াত লিখেছি কেননা আমি পবিত্র কুরআন থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, খেলাফত ছাড়া রাজত্বও হস্তগত হবে না, ভয়-ভীতিও দূর হয়ে শান্তি লাভ হবে না, কেবল খেলাফতের মাধ্যমেই এগুলো সম্ভব।" *(আল কুরআনুল উলুমুল আসারিয়্যা, পৃ. ২১)*

অতএব আজ যদি কেউ প্রকৃত উন্নতি লাভ করতে চায়, যে-ই প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে চায়, যে-ই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে চায়, তাকেই খেলাফতের পতাকাতলে আশ্রয় নিতে হবে। এই ঐশী ব্যবস্থাপনার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে, তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সকল দিক-নির্দেশনা মান্য করে সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে।

মহানবী (সা.) ১৪০০ বছর পূর্বে বলেছিলেন,

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيًّا، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ سَكَتَ:

অনুবাদ: হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাহেন। এরপর আল্লাহ্ তা তুলে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর তিনি তা তুলে নিবেন। তখন যুলুম অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা' ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা' তুলে নিবেন। তখন তা' অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা' ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তা' তুলে নিবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।" *(আহ্‌মদ, বায়হাকী)*

এই হাদীসের পূর্ণতা কীভাবে হল তা একটু পরিস্কার করে দিচ্ছি। মহানবী (সা.) ধর্মের বীজ বপন করে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর বিভিন্ন গোত্রের মুসলমান মুর্তাদ হতে থাকল। আল্লাহ্ তা'লা বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন মুসলমানদেরকে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর হাতে একত্রিত করে দিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন খলীফা হন তখন মুসলমান নামধারী কিছু মূর্খ আরববাসী মুর্তাদ হয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়। এটি ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম কঠিন সময় ছিল। একদিকে রোমান সাম্রাজ্যের আক্রমণের শঙ্কা অন্যদিকে আরববাসীদের বিদ্রোহ এবং তাদের পক্ষ থেকে মুর্তাদ হওয়ার ফিতনা। এই সমস্যা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছিল। মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে মস্তক অবনত করে রাখা এবং চুপচাপ এক ব্যক্তিত্ব খেলাফতে অধিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে এমন বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেন যা দেখে বিশ্ব হতবাক হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কথা বলছি যিনি দ্রুততার সাথে ধর্মত্যাগী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দমন করার পরিকল্পনা হাতে নেন। সফলভাবে এই কাজ সমাধা করেন, মদীনা রাষ্ট্র সুরক্ষা করেন এবং তার দু'বছর খেলাফতকালে তিনি মুসলমানদেরকে পুনরায় এক করেন। এরপর একে একে চার খলীফা এবং এই কাল প্রায় ৩০ বছর ব্যপ্তি ছিল।

এই সময়ে মুসলমান একে একে উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকল। খেলাফতে রাশেদার বরকতে ইসলাম আরব থেকে বের হয়ে রোম, ইরান এবং অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকল। মুসলমান যেখানেই গিয়েছে, তারা নিজেদের আদর্শ উপস্থাপন করেছে এবং তবলীগের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তৃত করেছে। আর পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর বইয়ে দিয়েছে। আর জগতের প্রত্যেক প্রান্তে মুসলমান সফলতার পর সফলতা লাভ করতে থাকল। এমনকি কিসরা ও কায়সারের ন্যায় পরাশক্তিগুলো বিদ্ধস্ত হয়ে ইসলামের সম্মুখে মাথা নত করেছে। কিন্তু যখন মুসলমানরা খলীফার আনুগত্য এবং পুণ্য কর্মের শর্তে আমল করলনা, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছ থেকে এই নেয়ামত ছিনিয়ে নিলেন। খেলাফতে রাশেদার যুগ শেষ হল। সাথে সাথে মুসলমানরা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হবার ফলে মুসলমানদের অধপতন শুরু হয়ে গেল।

অতএব খেলাফতের আনুগত্য না করায়, খেলাফতের যথাযথ মূল্যায়ন না করায় যে অপূরণীয় ক্ষতি হল তা স্বীকার করতে গিয়ে "জদ্দু জিহাদ" পত্রিকা ডিসেম্বর ১৯৬০ সালে লেখে, "সবচেয়ে বড় জুলুম যা মুসলমানরা

নিজেদের স্বার্থপরতায় করেছে, তা হল, খেলাফত আলা মিনহাজিন্ নবুয়্যতের সিলসিলাহ ধুলিস্যাৎ করে ছেড়েছে। আর উম্মতে মুসলিমাকে ভেড়ার দলের ন্যায় জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে যে, যাও চরে বেড়াও স্বাধীন খাও।

পত্রিকায় আরও লেখা হয় যে, খেলাফতই এমন এক নেয়ামত ছিল, যা মুসলমানদের দলাদলি হয়ে বিক্ষিপ্ত হবার বদলে এক কেন্দ্রে একত্রিত করে রাখতে পারত। আর এর নিয়ম-নীতি নির্ধারনের মাধ্যমে সংগঠন পাকাপোক্ত রাখতে পারত।

সুধি পাঠক! আজও উম্মতে মুসলিমা এ বিষয়টি খুব ভাল করে জানে, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে মুসলমান যে মহান উন্নতি লাভ করেছিল, তা ছিল কেবল নেযামে খেলাফতের কারণে। মুসলমান এ কথাও ভালোভাবে জানে যে, মুসলমানদের অধপতন খেলাফত থেকে বঞ্চিত থাকার কারণেই হয়েছে। জ্ঞানীরা এবং মুসলমানদের জন্য যাদের হৃদয় কাঁদে, তারা আজও এই আশা রাখে যে, হায়! উম্মতে মুসলিমা যদি পুনরায় খেলাফতের নেয়ামত লাভ করত তবে কতই না ভাল হত।

"তানজিম এহলে হাদীস" নামক পত্রিকা ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে খুব আফসোসের সাথে লিখেছে, জীবনের এই শেষ মুহূর্তে খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যতের দৃশ্য যদি দেখতে পাই, তাহলে হতে পারে উম্মতে মুসলিমার এই ভগ্নদশা ঠিক হয়ে যাবে। আর অভিমানকারী খোদার মন পুনরায় ভাল হয়ে যায়। আর পানির চর্কিতে ঘুরতে থাকা এই নৌকা হয়ত সেখান থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ তীরে গিয়ে আশ্রয় নিবে।

আর শায়েরে মাশরেক আল্লামা ইকবাল তো বলেই ফেলেছেন:

تا خلافت کی بنا دُنیا میں ہو پھر اُستوار
لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر

অনুবাদ: পৃথিবীতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজনে পূর্ববর্তী বুজুর্গদের ন্যায় ব্যক্তি খুজে বের করো।

মোটকথা আজকের যুগে খেলাফতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়টি কেউ অস্বীকার করে না। দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন আঞ্জুমান, আর সোসাইটির পক্ষ থেকে বারবার খেলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনো তাহরিকে খেলাফত নামে, আর কখনো মাজলিশে মুশাভেরাত রাবেতা আলমিয়া ইসলামিয়া নামক চমৎকার চমৎকার টাইটেলের মাধ্যমে। আর এ ধরনের কনফারেন্স কখনো মক্কা-মদীনাতে, আর কখনো লাহোর আর লন্ডনে করা হয়েছে। এমনকি অনেক ইসলাম অধ্যুষিত রাষ্ট্রপ্রধানগণ খলীফাতুল মুসলিমিন এবং আমিরুল মু'মিনিন হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরিশেষে বেদনাদায়ক মৃতুর মাধমে এ জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু দেখার বিষয় হল, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে কি কেউ খলীফা হতে পেরেছে?

খেলাফতের ছায়াতলে বিশ্ব ঐক্য, এ বিষয়ে আমি আপনাদেরকে কিছু বলতে চাই। সুধি পাঠক, খেলাফতের বিষয়টি জামা'তে আহমদীয়ার জন্য জীবনশীরা বিশেষ। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে খেলাফতের বিষয়ে মুসলমানদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে,

অনুবাদ: হে মুসলমানরা, তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনবে আর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন যে, অবশ্যই তাদের মাঝে খেলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন। *(সূরা নূর: ৫৬ দ্রষ্টব্য)*

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ঈমান এবং আমলে সালেহা তথা পুণ্যকর্ম– এই দু'টি শর্ত ধার্য্য করে দিয়েছেন উম্মতে মুহম্মদিয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: **"ওয়া'তাসিমু বি হাবলিল্লাহি জামিআন ওয়ালা তাফাররাকু"**

অনুবাদ: তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

সমস্ত জগতের হেদায়েত আল্লাহ্ তা'লা হাবলুল্লাহ হিসেবে দান করেছেন। হাবলুল্লাহ দ্বারা দ্বীনে ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সত্ত্বাও বটে এবং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সত্ত্বাও যাকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে সমস্ত জগতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, এছাড়া খেলাফতে আহমদীয়াও হাবলুল্লাহ, যার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক আমাদের ঐক্য, উন্নতি এবং নাযাতের ওসিলা। আল্লাহ্ তা'লার অবতীর্ণকারী এই রশিকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে রাখা আমাদের জন্য আবশ্যক। বিশ্ব ঐক্যের মাঝে এক গভীর প্রজ্ঞা এবং সত্যতার ওপর নির্ভর করে।

হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, ইসমাউ সাওতাস সামা', জাআল মাসীহ, জাআল মাসীহ–

আকাশবানী শোন, মসীহ্ এসে গেছে, মসীহ্ এসে গেছে।

তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে। দেখ! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী জাগতিকভাবেও পূর্ণতা দিয়েছেন। আজ মুসলিম বিশ্বে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বৈশিষ্ট্য, যাদের এমন এক টেলিভিশন চ্যানেল আছে যা ২৪ ঘন্টা পৃথিবীর ২৭টি ভাষায় ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করে চলেছে। আজ পৃথিবীর অন্য কোন ফির্কার এমন প্রচার মাধ্যম নেই, যার বাণী এক মুহূর্তে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ধ্বণিত হচ্ছে আর সমস্ত জগতকে এক খোদার বাণী শোনান হচ্ছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেক যুগের মুসলমানদেরকে এই আদেশ দিয়েছিলেন যে, যখন মুসলমানদের মাঝে ফিতনা-ফাসাদ, রক্তারক্তি সীমাতিক্রম করবে তখন তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে, **"তালযামু জামাআতাল মুসলিমিনা ওয়া ইমামাহুম"** তথা মুসলমানদের জামা'ত আর তাদের ইমামের হাতে বয়াত করে তার সাথে সংযুক্ত থাকবে। *(মিশকাত, কিতাবুল ফিতান ও আবু দাউদ)*

সুধী পাঠক! আজ মুসলিম বিশ্ব শতধা বিভক্ত। এই ভয়ানক অবস্থায় একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একক বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা নিজেদের খলীফার এক হাতে সবাই একত্রিত। এ এক ঐশী খেলাফত, সেই খোদা-ই তাকে সাহায্য করেন। তাকে পথ দেখান। আর খেলাফতের নেয়ামতে জামা'তে আহমদীয়ার মাঝে কেবল ঐক্য আর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের যুগ খলীফা বিগত কয়েক বছর ধরে পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধ

সম্পর্কে সাবধান করছেন। একদিকে তিনি সেই ভয়ংকর বিপদ সম্বন্ধে জগতকে অবগত করছেন আর এর ফলে যে ধ্বংসযজ্ঞ হবে সে বিষয়েও অবগত করছেন। অপর দিকে রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)-এর দাসত্বে সেই দয়ার দৃশ্য আমরা দেখতে পাই। জামা'তের সদস্যদের জগদ্বাসীর জন্য বার বার দোয়া করার জন্য যুগ খলীফা তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন:

"প্রতিদিন এক নতুন সংবাদ আসে যে, আজ যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত হতে যাচ্ছে, আজ ধ্বংস হতে চলেছে। বড় বড় পরাশক্তিদের দেখে বাহ্যত মনে হয়, যুদ্ধের দিকে তারা যে গতির সাথে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হবার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তাই আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আর বিশেষত আহমদীদেরকে ঐ যুদ্ধসমূহের মন্দ পরিনাম থেকে সুরক্ষিত রাখুন। যদি এখনও আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের সংশোধন সম্ভব হয়, আর সংশোধনের কোন মাধ্যম সৃষ্টি হয়, যদি তারা খোদা তা'লাকে চিনতে পারে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেই অবস্থা সৃষ্টি করুন যেন তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সনাক্ত করতে পারে আর ধ্বংস থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। (খুতবা জুমু'আ, ১৮ মে, ২০১৮, সাপ্তাহিক বদর, ৭জুন ২০১৮)

"খেলাফতের আনুগত্য, সফলতার চাবিকাঠি" –এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, যদি আপনারা উন্নতি করতে চান এবং এ জগতে বিজয় লাভ করতে চান, তাহলে আপনাদের জন্য আমার উপদেশ, আপনাদের জন্য আমার বাণী হল, আপনারা খেলাফতের সাথে সংযুক্ত হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার এই রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরুন। কেননা আমাদের সকল উন্নতির মূলমন্ত্র হল খেলাফতের সাথে যুক্ত থাকা। (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৩-৩০ মে ২০০৩, পৃ. ১)

খেলাফতের মাধ্যমে ঐশী সাহায্য এবং একক নেতৃত্বে সকলে এক হয়ে যাওয়ার দৃশ্য এখন আমরা সর্বদা সব জায়গায় দেখতে পাই। একটু দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, খেলাফতে খামেসার যুগ যখন শুরু হল, তখন এক অভুতপূর্ব দৃশ্য সমস্ত জগত দেখতে পেল। খলীফা নির্বাচিত হবার পর হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর প্রথম আদেশ পালন করতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর আহমদীরা তৎক্ষনাত বসে যায়। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের মানুষও নিজ নিজ জায়গায় বসে যায়। খেলাফত জুবলীতে এক আদেশে সমস্ত জগতের আহমদীরা দাঁড়িয়ে পড়ল। যখন হুযূর আনোয়ার (আই.) খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা, আনুগত্য এবং কুরবানীর অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন তখন মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত পৃথিবীর আহমদী এক হয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) যখন ঘানা গেলেন তখন সেই দৃশ্য দেখা গেছে যে, হুযূর আনোয়ার আহমদীয়াতের পতাকা উড্ডিন করছেন আর সাথে সাথে দেশের সর্বপ্রধান নিজ দেশের পতাকা উত্তোলন করছে। এমন দৃশ্য কানাডার সবচেয়ে বড় মসজিদ উদ্বোধনের সময়ও দেখা গেছে। হুযূর আনোয়ার আহমদীয়াতের পতাকা উড্ডিন করছেন আর দেশের প্রধানমন্ত্রী কানাডার পতাকা উড্ডিন করছেন। এমন এক যুগ ছিল, যখন জামা'তের কোন মোবাল্লেগ কোন দেশে তবলীগের উদ্দেশ্যে গেলে তাদেরকে জেলে প্রবেশ করান হত। আর এখন এমন যুগ এসেছে, যুগ খলীফা এমন অনেক দেশে গেলে সেসব দেশের সরকারপ্রধানরা খলীফাকে সর্বোচ্চ সম্মানে সুস্বাগতম জানায়। দেশের মেয়রগণ তাদের শহরের চাবি খলীফার কাছে পেশ করা নিজেদের সম্মান মনে করে। বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রীরা হুযূরের সেবায় উপস্থিত হয়ে দেশ চালানোর বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করে এবং দোয়ার দরখাস্ত করে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর সাহায্য ও সহযোগীতার নতুন নতুন দ্বার উম্মোচিত হচ্ছে। জাগতিক দৃষ্টিতে খলীফার মাথায় না কোন স্বর্ণের মুকুট আছে, না তাঁর কোন সিংহাসন আছে আর না কোন প্রধানমন্ত্রীত্ব, কিন্তু দেখার বিষয় হল, খোদার সাহায্যে বিশ্ব ঐক্যের নিদর্শন হয়ে স্বদেশ ও বিদেশ এমনকি সমগ্র বিশ্বের পবিত্র লোকদের হৃদয় রাজত্বের বাদশাহ হয়ে বসে আছেন। এটি ঐশী সাহায্যের কারিশমা নয় তো কী? আধ্যাতিক এই বাদশাহ আজ কোটি হৃদয়ের হৃদস্পন্দ হয়ে আছেন। **"যালিকা ফাযলুল্লাহি ইউতিহি মাইয়াশা"**। তথা, এ হল ঐশী কৃপা, যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ্ তা দান করেন।

অবশেষে, দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে ঐশী খেলাফত তথা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলিফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করার সৌভাগ্য দান করুন এবং আল্লাহ্ তা'লা এই আনুগত্য কবুল করুন আর আমাদের জামা'তের সবাইকে আর আমাদের সন্তানসন্ততিকে ইহকালে ও পরকালে অগনিত কল্যানে ভূষিত করুন এবং খেলাফতের বিশ্ব বিজয় ও সর্বাঙ্গীন সফলতা দান করুন, আমীন।

DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery | Teeth Whitening
Dental Fillings | Dental Implant
Root Canal Treatment | Orthodontics (Braces)
Dental Crowns, Bridges | In-House Dental X-RAY

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

বিশ্বনবী (সা.)-এর মেরাজ ও দর্শন

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলামে মেরাজের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা উইকিপিডিয়ায় মেরাজ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে- "যদিও ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ কুরআন-এ 'মেরাজ' শব্দটির উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু যখন অবিশ্বাসীগণ মুহাম্মদের নবুওয়্যতের বা ঐশ্বিক বাণীর প্রমাণস্বরূপ স্বর্গে আরোহণকরত প্রমাণ আনতে বলে, তখন সেখানে উল্লিখিত শব্দ ছিল তারকা ফিস সামা-য়ী: স্বর্গে আরোহণ করো। কেউ কেউ বলে, তারকা মানে আরোহণ করা, আর শব্দটি রাকিয়া থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'সে আরোহণ করেছিল'। আরবি মেরাজ শব্দটি আরাজা থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ সে আরোহণ করেছিল। তারা আরও বলে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট যেমন, রাকিয়া দ্বারা দৈহিক আরোহণ বোঝায়, আর আরাজা দ্বারা আত্মিক আরোহণ বোঝায়। তাই তাদের মতে মিরাজ হল 'আত্মিক আরোহণ'। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর আলেমগণের মতে মেরাজ সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল।"

কেউ মনে করেন বিশ্বনবীর (সা.) মেরাজ বোরাকযোগে মসজিদুল হারাম, বাইতুল্লাহ থেকে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা সশরীরে ভ্রমণ করে সেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকে পরিভ্রমণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত অর্জন এবং তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন।

অপর এক শ্রেণির বিশ্বাস মেরাজের ঘটনা সম্পূর্ণ আত্মিক। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, বিশ্বনবী ও শ্রেষ্ঠনবীর (সা.) এই সফর দৈহিক ছিল না আত্মিক ছিল? সত্য উদ্ঘাটন করতে গেলে আমাদেরকে পবিত্র কুরআন অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতে হবে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, 'তিনি পরম পবিত্র ও মহিমায়, যিনি রাত্রিযোগে আপন বান্দাকে মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চারদিকে আমি বরকত মণ্ডিত করেছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'।

প্রকৃত বিষয় হল, অধিকাংশ জ্ঞানসম্পন্ন তফসিরকারকের মতে মেরাজ হল মহানবী (সা.)-এর এমন এক কাশফ বা দিব্যদর্শন যা আত্মিক সফর হিসেবে রাত্রিকালে সুসম্পন্ন হয়েছিল, যাকে অত্মিক স্বর্গারোহণও বলা হয়।

মক্কা থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত পবিত্র কুরআনে যে সফরের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটি মূলত মহানবী (সা.)-এর ইসরা। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, এটি মহানবীর (সা.) নবুওয়্যতের একাদশ বছরে সংঘটিত হয়েছিল আর কোনো কোনো খ্রিস্টান লেখকের মতে তা নবুওয়্যতের দশম বছরে ঘটেছে। ইবনে সা'আদ এবং মারদাওয়াইয়ের মতে, হিজরতের এক বছর আগে রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে এ ঘটনা ঘটেছে (আল খাসাইসুল কুবরা)। বায়হাকিও বর্ণনা করেছেন এটি হিজরতের এক বছর বা ছয় মাস আগে সংঘটিত হয়েছিল।

বিভিন্ন বর্ণনা মতে, এটাই স্পষ্ট হয় নবুওয়্যতের দ্বাদশ বছরে হিজরতের এক বছর বা ছয় মাস আগে ইসরার ঘটনা ঘটেছিল। হযরত খাদিজার (রা.) মৃত্যুর পর হযরত মহানবী (সা.) যখন হযরত উম্মে হানীর (রা.) ঘরে অবস্থান করছিলেন, সেই দিনগুলোর কোন এক রাতে এই ইসরার ঘটনা ঘটে। অথচ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, মেরাজের ঘটনা ঘটেছিল নবুওয়্যতের পঞ্চম বছরে।

এতে দেখা যাচ্ছে, ইসরা ও মেরাজের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়ের মধ্যেও ৬-৭ বছরের ব্যবধান রয়েছে। কাজেই মেরাজ ও ইসরা এ ঘটনা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন, একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এছাড়া ওই সব ঘটনা যা মহানবীর (সা.) মেরাজের ঘটনা বলে হাদিসে উল্লিখিত হয়েছে তা ইসরার ঘটনাবলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

আসলে পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা হল মহানবী (সা.) সশরীরে ঊর্ধ্বগমণও করেন নি আর সশরীরে জেরুজালেমও গমন করেন নি। পবিত্র কুরআনের সূরা আন নাজমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মেরাজ সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া হয়েছে কিন্তু ইসরা সম্পর্কে কোনো পরোক্ষ আয়াত পর্যন্ত নেই। আর ইসরা সংঘটিত হওয়ার রাতে মহানবী (সা.) তার চাচাতো বোন উম্মে হানীর (রা.) ঘরে ছিলেন এবং তাকে তিনি (সা.) শুধু তার জেরুজালেম সফরের কথাই বলেছেন, জান্নাত সফরের কোন কথাই বলেন নি।

তিনি (সা.) যদি হযরত উম্মে হানীকে (রা.) কিছু বলতেন তাহলে তিনি (রা.) তার একাধিক বর্ণনার কোনো একটিতে অন্তত এ বিষয়ের উল্লেখ না করে পারতেন না। কিন্তু তিনি (রা.) তার কোনো বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ না করায় এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় মহানবী (সা.) যে রাত্রিতে

জেরুজালেমে আধ্যাত্মিক সফর করেছিলেন সে রাত্রিতে মেরাজ সংঘটিত হয় নি।

সূরা নাজম ও সুরা বনিইসরাইল থেকে যা জানা যায়, তা হল মহানবীর (সা.) ইসরা নামক একটি আধ্যাত্মিক সফর হয়েছে আর মেরাজ নামে আরেকটি আধ্যাত্মিক সফর হয়েছে। মহানবীর (সা.) পবিত্র জীবনে মেরাজ শুধু একবারই যে ঘটেছে তাও ঠিক নয়, কারণ সিনা চাক তথা বক্ষ বিদীর্ণ করে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করার যে ঘটনাটি তার শৈশবেই ঘটেছিল, যখন তিনি (সা.) ছাগল চরাচ্ছিলেন। বিষয়টা স্পষ্ট যে, মেরাজ কোন এক ঘটনার নাম নয়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে মহানবীর (সা.) মেরাজ অনেকবারই হয়েছে। এছাড়া মহানবী (সা.) এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, মু'মিনের মেরাজ হয় নামাযের মাধ্যমে। অর্থাৎ মু'মিন মুত্তাকিরাও আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেন নামাযের মাধ্যমে। আর এ রাস্তা এখনও খোলা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মহানবীর (সা.) মেরাজ যদি দৈহিক হয়ে থাকে তাহলে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াত মিথ্যা প্রমাণিত হয়, নাউজুবিল্লাহ্। পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক যেভাবে নাজিল করেছেন এর একটি জের, জবর পরিবর্তন করার ক্ষমতাও যেমন কারো নেই, তেমনি আল্লাহ্‌র কোনো আয়াত ভুল হতে পারে না।

সশরীরে আকাশে যাওয়া পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী:

যেমন মক্কার মুশরিকরা যখন মহানবীর (সা.) কাছে দাবি উত্থাপন করে বললেন, তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাক তাহলে আমাদের জন্য ভূমি থেকে প্রস্রবণ প্রবাহিত কর অথবা খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করো, আর আমাদের ওপর আকাশ টুকরো টুকরো করে ফেল অথবা আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাদের আমাদের সামনাসামনি এনে খাড়া করো। অথবা তোমার জন্য স্বর্ণ নির্মিত কোনো ঘর হয় অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করো এবং আমরা তোমার আকাশে আরোহণ কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের উপর কোন কিতাব নাজেল কর যা আমরা পাঠ করতে পারি। কাফেরদের এসব আপত্তির উত্তরে আল্লাহ্ তা'লা মহানবীকে (সা.) বলেছিলেন, তুমি বল আমার প্রতিপালক পবিত্র, আমি কেবল একজন মানব রসূল। *(সূরা বনিইসরাইল: আয়াত ৯১-৯৪)*

একটু ভেবে দেখুন! তাদের যা দাবি ছিল তা মানবীয় শক্তির অসাধ্য এবং আল্লাহ্ তা'লার নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। অনেকে হয়তো বলতে পারেন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। হ্যাঁ, আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করতে পারেন, কথাটা একান্তই সত্য কিন্তু আল্লাহ্ তার বিধানের বাইরে কিছুই করেন না। আল্লাহ্‌র বিধানে এটা নেই যে, কোনো রক্ত-মাংসের মানুষ সশরীরে আকাশে উঠে যাবেন। যেটা আল্লাহ্‌র বিধান পরিপন্থী কাজ তা তিনি কীভাবে করতে পারেন?

এছাড়া সূরা বনি ইসরাইলের ৯৩ আয়াতে মহানবীর (সা.) দৈহিকভাবে উর্ধ্ব আকাশে গমন অসম্ভব বলে আল্লাহ্ তা'লাই জানিয়েছেন, তাহলে কীভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, মহানবীর (সা.) মেরাজ দৈহিকভাবে হয়েছিল? আর মেরাজের ঘটনা যদি দৈহিকভাবেই ঘটে থাকত তাহলে কাফেররা মহানবীকে (সা.) অবশ্যই বলত, তুমি না সশরীরে সব আকাশ ঘুরে এসেছ, এখন তাহলে কেন বলছ এটা মানব রসূলের পক্ষে সম্ভব না?

শ্রেষ্ঠ নবীর (সা.) মেরাজ নিয়ে মতভেদ না করে আমরা যদি এটিকে আত্মিক মনে করি, তাতে কিন্তু কুরআনের সত্যতা এবং বিশ্বনবীর (সা.) শ্রেষ্ঠত্ব আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। কেননা, পবিত্র কুরআন যেখানে বলছে মানব রসূলের পক্ষে আকাশে আরোহণ করা সম্ভব নয়। তাই যা পবিত্র কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় তা গ্রহণ ও বিশ্বাস করতে হবে আর এর মাধ্যমেই আমাদের কল্যাণ নিহিত। এছাড়া মুসলিম বিশ্ব যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করে তাহলে বিশ্ব মুসলিমের মাঝেও ঐক্য ফিরে আসবে এবং বিশ্বময় হবে শান্তিময়।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই প্রার্থনাই করি, তিনি যেন আমাদের আত্মাকে শান্তিময় করেন আর ইহ জীবনেই যেন লাভ করতে পারি আল্লাহ্‌পাকের জান্নাতের স্বাদ। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর ওপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট আর এই পর্যায়ে যখন মু'মিনের আত্মা উপনিত হয়, তখনই আল্লাহ্ পাক তাকে মেরাজের মর্যাদায় ভূষিত করেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মেরাজের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

Hakim Water Technology & Filter House
Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com
DRINKING WATER PLANT (INDUSTRIAL)

DRINKING WATER PURIFIER (HOUSEHOLD)
OUR SERVICES:
Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.
VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, কলকাতার অতিথিপরায়ণতা এবং কিছু অভিজ্ঞতা

খন্দকার মাহবুবউল ইসলাম

জলপাইগুড়ি বইমেলা শেষে ৫০ কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়ি মিশন হাউজে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় বারটা। তীব্র শীত আর ঘন কুয়াশার কারণে তিন জনকে নিয়ে শিলিগুড়ির আঞ্চলিক মুরুব্বি জনাব জিয়াউল হক সাহেব খুব সাবধানে মোটর বাইক চালাচ্ছিলেন। মুরুব্বি সাহেব মিশন হাউজে অ-আহমদীদেরকে চিকিৎসা সেবার একটা বর্ণনা দিলেন। এতে করে আহমদীয়াতের নিরব তবলীগ হয়। ১৯ ডিসেম্বর ভোর সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন। আমরা মিশন হাউজ থেকে টোটোতে (অটোতে) করে প্রায় এক ঘণ্টা আগে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। শীতের কাপড় চোপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বেশী বেশী নেয়ার কারণে আমার লেদার বক্সটি ভীষণ ভারী হয়েছে। স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব জমীরুদ্দিন সাহেব জোর করে আমার হাত থেকে লেদার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে টোটোতে তুলে দিলেন। মনে মনে ভাবলাম রেলস্টেশনে ব্রীজের শিড়ি, ভারী লেদার বক্স নিয়ে কিভাবে পাড়ি দেব? কিন্তু মহান আল্লাহ্ সহায়। টোটো থেকে নামতেই রেলের বিশাল ব্রীজ চোখে পড়ল যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অনেক লম্বা। কিন্তু তাতে কোন শিড়ি নেই। ক্রমশ ঢালু হয়ে দুই প্রান্ত নীচে নেমে এসেছে। এছাড়া ব্রীজের ডানে বামে যত প্লাটফর্ম আছে, সব প্লাটফর্মে নামার জন্য রাস্তা ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। এর ফলে যত ভারী লেদার হোক না কেন ঢালু বেয়ে উপরে তুলতে বা নামাতে কারো কোন সমস্যা হয় না। আরামদায়ক শতাব্দি এক্সপ্রেসে মেহমানদারীরও কোন কমতি ছিল না। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর দেড়টার মধ্যে দুইবার হালকা নাস্তা চা বিস্কুট, জুস, মাখন এক ধরণের শক্ত খোরমা, ১ বার ফুল নাস্তা ডিম/চিকেন, মাখন, সবজী রোল, পারুটি, চা; দুপুর একটায় লাঞ্চ ; চিকেন/সবজী, ডাল, ডিমের পুডিং, ভাত, তেলে ভাজা রুটি, দই এবং সব শেষে কাপ আইস্ক্রিম। রেলের নির্বিঘ্ন চলাচল ও উত্তম ব্যবস্থাপনার জন্য ভারতের রেল মন্ত্রণালয় ও সরকারের প্রশংসা না করে পারছি না। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা পর্যন্ত পথ পরিক্রমায় কোন স্টেশনেই মাত্রাতিরিক্ত বিরতি ছিল না। সব স্থানে ডবল লাইন। অতএব কখনো কোন ট্রেনের আসার জন্য কোন ট্রেনকে ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে হয় না। রেল লাইনের দু'পাশে ছোট ছোট খুঁটি দ্বারা চিহ্নিত নিরাপদ দূরত্বে বাড়ীঘর, স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান। শত শত কিলোমিটার পেরিয়েও এর কোন ব্যাতিক্রম পাই নি। সবাই সুন্দরভাবে নিয়ম মেনে সব কিছু করছে। পরম করুণাময় মহান আল্লাহ্ ভারতে মসীহে মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদের জন্য এত আরামদায়ক, আনন্দদায়ক ভ্রমণের ব্যাবস্থা করেছেন যে তার শুকর আদায় করে শেষ করা যায় না।

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে এক সময় এলো ফারাক্কা বাঁধ। এ বাঁধ বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত হতে ভারতের প্রায় ১৮ কিলোমিটার অভ্যন্তরে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গা/পদ্মার পানি প্রত্যাহার করে সেই পানি দিয়ে হুগলি নদীর পলি ধুয়ে মুছে হুগলী-ভাগিরথীর নাব্যতা বৃদ্ধি পূর্বক কলকাতা বন্দরকে সচল করার জন্য ১৯৬১-১৯৭৫ সালে ২,২২৪ মিটার লম্বা এ বাঁধটি সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় তৈরি করে ভারত সরকার। এ বাঁধে ১০৯ টি গেট রয়েছে। বাঁধের একদিকে দিগন্ত বিস্তৃত অথৈই জলরাশি, পাশে পাহাড় সমান উঁচু স্থাপনা। বিশাল কাণ্ড কারখানা। তবে এ বাঁধের কারণে উভয় দেশ (বাংলাদেশ-ভারত) মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে বলে উভয় দেশের পরিবেশ বিজ্ঞানীরা দাবী করেছেন।

ট্রেনে, পাশে বসে থাকা গাইবান্ধার যয়ীম সাহেবের সঙ্গে আলাপ করছিলাম যে, কলকাতায় গিয়ে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত হোটেলে খেতে হবে। (কারণ ২৪ ডিসেম্বরে দুর্গিয়ানা এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে অমৃতসরের টিকিট পেয়েছি, এর পূর্বের টিকিট পাই নি। এদেশে সাধারণত দূরপাল্লার গন্তব্যে সুবিধাজনক তারিখে সুবিধাজনক আসনে টিকিট পেতে হলে ২/৩ মাস আগে টিকিট করে রাখতে হয়।) ইতিপূর্বে শুনেছি, কলকাতার মানুষ নাকি খুবই কৃপণ। আধাকাপ করে চা মাটির পেয়ালায় খায়।

হাওড়া স্টেশনে নেমে হাওড়া সিটি পুলিশ নিয়ন্ত্রীত প্রি-পেইড টেক্সি ভাড়া নিলাম। তফসিয়া থানার সামনে রাস্তার উলটো

দিকে ২০৫ নিউ পার্ক স্ট্রিটে আমাদের মিশন হাউজ ও মসজিদ অবস্থিত । লাইনে দাড়িয়ে টিকিট করতে হয়। ভাড়া নিল ২১৩/ টাকা। এখানে প্রতারিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই । অবারিত প্রবেশ পথ দিয়ে মিশন হাউসে ঢুকতেই মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশানুসারে এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত (দীক্ষা) নেয়ার পর থেকে কলকাতা জামা'তের কথা শুনে আসছিলাম। কলকাতা জামাতের সাবেক আমীর মরহুম মাশরেক আল্লী মোল্লা সাহেবের সাথে পরিচয় হওয়ার পর তাঁর আল-বুশরা পত্রিকার মাধ্যমে কলকাতা ও তার আশে-পাশের জামাত সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি।

প্রবেশ পথের পাশেই লাইব্রেরী ও রিডিং রুম। রাস্তা দিয়েও সরাসরি লাইব্রেরীতে প্রবেশ করা যায়। কাদিয়ান জলসা উপলক্ষে এখানে ঢালাও বিছানা করে দেয়া হয়েছে। সেখানে মীরপুরের আমীর মোহতরম গোলাম কাদের সাহেবের সাথে দেখা হয়। তিনি এবং তার বিয়াই সস্ত্রীক এসেছেন কাদিয়ান জলসায় যাওয়ার জন্য। কিছুক্ষণ পরে খুলনার আমীর সাহেবের সাথে দেখা হল। সেখানে শুনলাম খাবারের আয়োজন মিশন হাউজে করা হয়েছে। শুনে ভীষণ ভাল লাগল। একেতো বাড়তি খরচ, তার উপর আবার হোটেলে যাওয়া আসা আরেক বিড়ম্বনা। রাতে সবজী ডাল ভাত পরিবেশনের পরে মসজিদের উপরে একটু সাইডে দোতলায় দুটি বড় বড় রুমে ঢালাও বিছানা বিছিয়ে কাদিয়ান জলসায় যেতে ইচ্ছুক মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতে কর্মকর্তারা কাঁধে করে, কেউবা মাথায় করে কম্বল, বালিশ তোষক নিয়ে এসে সবাইকে আলাদা আলাদা ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। রুমের তালা চাবিও বুঝিয়ে দেয়া হল, যাতে করে কারো কিছু তছরুফ না হয়। পরদিন সকালে নাস্তা হিসেবে দেয়া হল স্টিলের প্লেটে করে লাল আটার সুস্বাদু ৩টি রুটি ও আলাদা স্টিলের বাটিতে করে পর্যাপ্ত ঘন ডাল। কেউ কিছু চাওয়া মাত্র আবার ৩টি করে রুটি ও পর্যাপ্ত ডাল দেয়া হচ্ছে। সাথে চা'তো আছেই। দুপুরে অল্প তৈল-মসলা দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত রান্না করা মাছ/ গরুর গোস্ত, ডাল ভাত; যা ছিল খুবই রুচিকর। গোস্ত প্রথমবারেই পর্যাপ্ত দেয়া হত, তারপরেও দ্বিতীয়বার সবাইকে দেয়া হত। কখনো কখনো রাতেও গোস্ত দেয়া হত। বড় বড় ব্যাবসায়ীরা, বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা তাদের ব্যবসা, তাদের প্রতিষ্ঠান ফেলে এসে আমাদের মত নগন্য মুসাফিরদের সেবা করতেন, সম্মান করতেন, খাবার পরিবেশন করতেন। বয়সে তরুন মোহতরম তানভীর আহমদ বাণী সাহেব, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কলকাতা, প্রতিদিন মিশন হাউজে এসে খাবার পরিবেশনা সহ অন্যান্য বিষয়াদি তদারকি করতেন। সবকিছু শুধুমাত্র এ যুগের মামুর মিনাল্লাহ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমান হবার কারণে। মসীহে মাওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত না হলে কলকাতায় এসে, এক গ্লাস পানিও হয়ত ফ্রী পেতাম না, সেবা সম্মান পাওয়াতো দূরের কথা ।

অনেক সুন্দর আপ্যায়ন ও সেবা যত্নের জন্য আমি এক কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি অতি বিনয়ের সাথে বললেন, 'এসবকিছুর কৃতিত্ব হুযূর (আই.)-এর, তাঁর (আই.) নির্দেশে সবকিছু হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্'।

জামা'তের নিবেদিতপ্রাণ জনাব নাসিম সাহেব আমার পরিচিতি পত্র ও জলসার আমন্ত্রণ পত্রের ফটোকপি চাইলেন। আমি বললাম বাহির থেকে ফটোকপি করে এনে দিচ্ছি। তিনি বললেন না আমাকে দেন, আমি ফটোকপি করে এনে মূল কপি আপনাকে ফেরত দিব। আমি টাকা দিতে চাইলাম , তিনি নিলেন না। এভাবে গড়ে প্রায় ৫০ জন মানুষের সেবা দিচ্ছেন তিনি হাসি মুখে। কারো টিকিট করতে হবে, কারো টিকিট বাতিল করতে হবে, কারো মোবাইলের সীম কেনার ব্যবস্থা করতে হবে, কারো রেল স্টেশনে যাওয়ার ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করতে হবে। সবই তিনি করছেন।

মসজিদের মোয়াজ্জিন সাহেব অষ্টম ও দ্বশম শ্রেণিতে পড়ুয়া দুই নাতীকে নিয়ে সর্বক্ষণ মেহমাননেয়াজীতে ব্যস্ত। দুই নাতী সবসময় কোন না কোন কাজে লিপ্ত। কখনো ঝাড়ু দিচ্ছে, কখনো লাজনার অংশে খাবার বিতরণ করছে, কখনো মেহমানদের আদেশ পালন করছে। আমি কখনো ওদেরকে স্থির অবস্থায় দেখি নি। আমি যখন ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন ওরা থালা বাসন পরিষ্কার করছিল। ওদের বাবা ডায়মণ্ড হারবার জামা'তে মোয়াল্লেম হিসেবে কর্মরত। নম্র, ভদ্র, কর্মঠ সুন্দর ছেলে দু'টোর জন্য এখনো আমার খুব কষ্ট হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর জীবদ্দশায় মেহমান নেয়াযীর যে অসংখ্য অনন্য নজির স্থাপন করেছেন; সেই ঘটনাগুলি আহমদী মুসলমানদেরকে অনুপ্রাণিত করে। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমি শুধু মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

প্রাথমিক যুগে জামা'তের তেমন কোন স্থাপনা ছিল না, মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ব্যক্তিগত ঘর দুয়ার ছাড়া। কিন্তু মেহমান তাঁর বাড়ীতে এসে প্রতিদিনই অবস্থান করত। মেহমানদের অত্যাধিক চাপ হলে তিনি (আ.) তাঁর বিবিসহ প্রায়ই ঘর এবং বারান্দা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে এক কোণায় অবস্থান করতেন। তাঁর (আ.) বিবি অম্লান বদনে সেই সব কষ্ট স্বীকার করে নিতেন। আরো অধিকতর অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য তিনি (আ.) তাঁর (আ.) বিবিকে একটি গল্প শোনাতেন। গল্পটি হচ্ছে, এই 'এক পথিক রাত হয়ে যাওয়ার কারণে এক গাছ তলায় আশ্রয় নিলেন। ঐ গাছে খড় কুটো দিয়ে বাসা বেঁধে বাস করছিল এক জোড়া পুরুষ ও স্ত্রী পাখি। পুরুষ পাখি স্ত্রী

পাখিকে বলল যে, দেখ! পথিক আমাদের মেহমান। প্রচণ্ড শীতে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। খড় কুটো দিয়ে বানানো এই বাসা ছাড়া আমাদের আর কোন সম্পদ নেই। আমরা এই বাসাটা দিয়ে পথিকের শীত নিবারণ করতে পারি। তো সেই অনুযায়ী তখনই শুকনো বাসাটা পথিকের সামনে ফেলে দেয়া হল। পথিক তাতে আগুন ধরিয়ে শীত নিবারণ করল। পুরুষ পাখিটি ভাবল শীত নিবারণ তো হল, কিন্তু ক্ষুধার্ত মেহমানকে আহার করানো দরকার। আমাদের কাছে আর কিছু নেই,– আমরা ছাড়া; আমরা যদি ঐ আগুনে লাফিয়ে পড়ে রোষ্ট বনে যাই, তাহলে পথিক আমাদেরকে খেয়ে পরিতৃপ্ত হবেন। তার ক্ষুধা নিবারণ হবে। তো যেই ভাবা সেই কাজ। মেহমানের ক্ষুধা নিবারণের জন্য পাখি দু'টো আগুনে লাফিয়ে পড়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিল। পথিক ওদেরকে খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করল।'

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এই গল্পের মাধ্যমে শুধু তাঁর (আ.) বিবি নয় বরং জামা'তের সকল সদস্যকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। আল্লাহ্‌র ফজলে জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যরা সেই হারানো মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত যে মূল্যবোধ আমাদের প্রিয় নবী, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জগতে কায়েম করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর যুগে ভাতৃত্ববোধের বাঁধনে এক মুসলমানের সঙ্গে আরেক মুসলমানের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হয়েছিল, একই ভাবে তাঁর গোলাম হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামাতেও এক আহমদী মুসলমানের সঙ্গে আরেক আহমদী মুসলমানের অনুরূপ সুদৃঢ় সম্পর্ক কায়েম হয়েছে। আহমদী মুসলমান পৃথিবীর যে দেশেই যাক না কেন, তাকে ঐ দেশের আহমদী মুসলমান বুকে জড়িয়ে ধরে এবং তার জন্য সব কিছু উজাড় করে দিতে চায়।

উত্তম মেহমানদারীতে খুব আরামে সময় অতিবাহিত হচ্ছিল আর অধীর আগ্রহে ২৪শে ডিসেম্বরের অমৃতসরের ট্রেনের অপেক্ষা করছিলাম। ঘুমিয়েও শান্তি পাচ্ছিলাম না। সব সময় শুধু একটাই চিন্তা কাদিয়ান, দারুল আমান। কাদিয়ানের অলি গলি, ধুলি-কণা, আলো-বাতাস সব যেন আমাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। ১৪০০ বছর আগে মহানবী (সা.) যে স্থানে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের উল্লেখ করেছেন, যাকে সালাম পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন; সেই স্থানে গিয়ে তাঁর কবরে সালাম না পৌঁছানো পর্যন্ত কোনভাবেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন,-

"মাহদী (আ.) 'কাদেয়া' নামক গ্রাম হতে আবির্ভূত হবেন" (জাওয়াহেরুল আসরার, ৫৬ পৃষ্ঠা)। "তোমাদের মধ্যে যে ইমাম মাহদীকে পাবে, তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে" (কনযুল উম্মাল)।

২১ ডিসেম্বর মসজিদে বাজামাত ফজরের নামায পড়ে বাইরে এসে মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় মুরুব্বি সাহেব বারান্দায় এসে বললেন "এইমাত্র হুযূর (আই.)-এর দফতর থেকে খবর এসেছে, কাদিয়ান জলসা স্থগিত করা হয়েছে, আর যেন কেউ সামনে অগ্রসর না হয়।"

অন্তর ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম জলসা না হোক , কাদিয়ান থেকে ঘুরে আসি। কিন্তু পরক্ষণই চিন্তা করলাম আল্লাহ্‌র খলীফার হুকুম তামিল করার মধ্যেই নিরাপত্তা ,শান্তি ও সমৃদ্ধি। এরপরে ট্রেনের টিকিটগুলি বাতিল করার জন্য জনাব নাসিম সাহেবের স্মরণাপন্য হলাম। তিনি একবার রেলের কাউন্টারে গিয়ে নির্ধারিত ফরম এনে আমাকে সাথে নিয়ে পূরণ করলেন। এরপরে আমরা একসাথে গিয়ে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকার টিকিট (কলকাতা অমৃতসর-নয়া দিল্লী-শিলিগুড়ি) তিন হাজার টাকায় (রুপী) বিক্রি করে এলাম।

২২শে ডিসেম্বর কলকাতা মিশন হাউজ, মসজিদ এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভারতকে বিদায় জানিয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে ট্রেনে করে গেদে পর্যন্ত এসে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে প্রবেশ করলাম। ষ্টেশনে আসার সময় ট্যাক্সি ঠিক করে দিয়েছিলেন জনাব নাসিম সাহেব। মহান আল্লাহ্ প্রাণ প্রিয় হুযূর (আই.)-সহ সবাইকে পুরস্কৃত করুন, আমীন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"পাক্ষিক আহমদী"** পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সংবাদ

ঢাকা জামা'তের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন

গত ২৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার আয়োজনে মহান মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশনের পর হযতর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সোলায়মান সুমন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আগমনের সত্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন। এরপর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত নসীহত ও সমাপনী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকত ও MTA বাংলাদেশের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি Youtube-এ লাইভ সম্প্রচার করা হয়।

মুহাম্মদ সাইদুর রহমান, নায়েব আমীর

মজলিস আনাসারুল্লাহ্, মিরপুরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুরের উদ্যোগে গত ১৪ মার্চ, ২০২০ রোজ শনিবার এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালা বা'দ আসর থেকে শুরু করে রাত ৯টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। নবনিযুক্ত আমেলার সদস্য, হালকা যয়ীমগণ এবং সায়েকগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের জন্য এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার পর কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মজলিসের যয়ীমে আলা জনাব আবু জাকির আহমদ সাহেব। তিনি আমেলার সদস্যদের পরিচিতি ও মজলিসের সার্বিক কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের নায়েব সদর ও কায়েদ উমুমী মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী সাহেব কর্মশালায় মূল প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। কর্মশালায় মিরপুরের ২৪ জন স্থানীয় আমেলার সদস্য ও ১৮ জন সায়েক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী সাহেব মজলিসের নিয়মিত বিভিন্ন কর্মসূচীর পাশাপাশি মজলিসে শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'মডেল মজলিস' এর রূপরেখা তুলে ধরেন এবং মিরপুর মজলিসকে এই উন্নত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

কর্মশালায় মোস্তাযেমগণের বিভাগীয় কর্মকাণ্ড ও রিপোর্ট প্রদান পদ্ধতি এবং কীভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম সফলভাবে করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় সদস্যদের সার্বিক তরবিয়তী মান উন্নয়নের ও শূরার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদের আদর্শ স্থাপন ও মজলিসের সকল সদস্যের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ঢাকা রিজিওনাল নাযেমে আলা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। মিরপুর জামাতের আমীর ও নায়েব সদর মোকাররম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেবের নসীহত মূলক বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার শেষ হয়। সভা শেষে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

মোহাম্মদ সোলায়মান, মোস্তাজিম উমুমী

ফতুল্লার উদ্যোগে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফতুল্লার উদ্যোগে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট মোহতরম আব্দুর রহমান সাহেব। সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব সৌরভ আহমদ সানী, উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মাসরুক আহমদ, তানভীর। অতঃপর বক্তব্য রাখেন জনাব ডা: আবু নাসির সাহেব এবং তার বক্তব্যের বিষয় ছিল, 'হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবসের পটভূমি'। 'হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অসাধারণ কুরআন করীমের সেবা'-এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মুরুব্বি সিলসিলাহ মোহতরম মওলানা খালেদ মুসনাদ খান। মোহতরম সভাপতি সাহেবের বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। সভায় মোট ৪২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আব্দুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, ফতুল্লা

তারুয়া জামা'তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ৯ মার্চ, ২০২০ মজলিস আনসারুল্লাহ্, তারুয়ার উদ্যোগে মোল্লাপাড়া হালকায় মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উৎযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মজলিস আনসারুল্লাহ্, তারুয়ার যয়ীমে আলা জনাব জহির আহম মিয়াজী। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব শফিউল আজম শশি। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব নওসাদ আহমদ, এরপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পর্যায়ক্রমে আলহাজ্জ খলিল আহমদ সাহেব, মওলানা নওসাদ আহমদ সাহেব, মুরব্বি সিলসিলাহ। এরপর সভাপতি সাহেব মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। সভাশেষে দোয়া পরিচালনা করেন তারুয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শাসু মিয়া।

জহির আহমদ মিয়াজী, যয়ীমে আলা

হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতে মালি কুরবানীর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক গত ১৩ মার্চ, ২০২০ জুমুআর নামাযের পর হেলেঞ্চাকুড়ি জামা'তে মালি কুরবানীর ওপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সেমিনারে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন স্থানীয় কায়েদ সাহেব, স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব এবং স্থানীয় সেক্রেটারী মাল সাহেব। উক্ত সেমিনারে আতফাল ৮ জন, খোদ্দাম ১২ জনসহ মোট ২০জন

উপস্থিত ছিলেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের বেশী বেশী মালী কুরবানী করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আব্দুল বারী, নাযেম মাল

হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতে পিতা-মাতা দিবস পালিত

গত ২০ মার্চ, শুক্রবার বাদ জুমুআ রিজিওনাল নাযেম আতফালের সভাপতিত্বে সফলভাবে পিতা-মাতা দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন বড় আতফাল জনাব মারুফ আহমদ। নযম পরিবেশন করেন নুরুদ্দীন। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন নাযেম মাল জনাব আব্দুল বারি, মোতামাদ ও নাযেম আতফাল জনাব মোসাদ্দেক হোসেন, স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব জনাব ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজি, কায়েদ আতিকুর রহমান, রিজিওনাল নাযেম আতফাল জনাব শামস-বিন-তারেক। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত পিতা-মাতা দিবসের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিতি ছিল ৪৪ জন।

মারুফ আহমদ, সেক্রেটারী উমুমী

মজলিস আনসারুল্লাহ্, চট্টগ্রামের বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত

গত ১৩ মার্চ, ২০২০ শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের বার্ষিক পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের চকবাজারস্থ মসজিদ বাইতুল বাসেত থেকে কুমিল্লার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করা হয়। সকাল ৭ ঘটিকা হতে নগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিবন্ধনকৃত আনসার সদস্যবৃন্দ এই পিকনিকে অংশগ্রহণের জন্য আসতে থাকে। গাড়ি ঠিক সকাল ৮:১০ ঘটিকায় সময় কুমিল্লার উদ্দেশ্যে

ছেড়ে যায়। বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে এই পিকনিক যাত্রা শুরু করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন জেলা নাযেমে আলা মোহতরম খালেদুর রহমান ভূইয়া সাহেব।

সবার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থানের সাথে আমাদের গাড়ি গন্তব্যের দিকে চলতে থাকে। ইতঃমধ্যে গাড়িতে সকালের নাস্তা সেণ্ডোইচ, ডিম, কলা ও পানি সবার হাতে হাতে আসে। গল্প-আড্ডা ও নাস্তা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ঠিক ১১ ঘটিকায় আমরা ফেনী এসে পৌঁছে যাই। সেখানে প্রায় ১৫ মিনিট যাত্রা বিরতি শেষে আবার গাড়ি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলে। আমাদের গাড়ি ময়নামতি, শালবন বিহার পিকনিক স্পটে পৌঁছে ঠিক ১২ টায়। এই পর্যায়ে যে যার মতো শালবন বিহার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শত শত দর্শনার্থীর ভীড়ে সমস্ত শালবন বিহার তখন পরিপূর্ণ। তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে তখনো অনেককে আসতে দেখা গেছে। জুমুআর সময় নিকটবর্তী হওয়ায় স্বল্প সময়ে শালবন বিহার ভ্রমণ শেষ করতে হয়, সবার আরো কিছুটা সময় ধরে দেখার আগ্রহ থাকলেও ঠিক সময়ে জুমুআর নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

কুমিল্লা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল মসজিদে সবাই জুমুআর নামায আদায় করে। পরবর্তীতে সবাই কুমিল্লা জামাতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এতে আনসারুল্লাহ চট্টগ্রামের যয়ীমে আলা জনাব এম আরিফুজ্জামান আমাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। মসজিদের নিচতলায় খোলা জায়গায় সকাল থেকে পিকনিকের জন্য রান্নাবান্না হচ্ছিল। জুমুআর নামায শেষ হতেই আমরা খাবার টেবিলে বসে পড়ি। গরুর মাংসের সাথে সালাদ, ডিম ও পোলাও খুবই দারুণ হয়েছে। খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত যে যার মতো আশেপাশে ঘুরাঘুরি করে সময় কাটাতে দেখা যায়। ইতঃমধ্যে আনসার সদস্যদের ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ খেলাটা সবাই দারুণ উপভোগ করে। বিকাল ৪ ঘটিকার সময় ২য় দফা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনে গাড়ি ছুটে চলে কুমিল্লার বিখ্যাত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি বার্ড-এ।

এখানে নামার সময় সবাইকে কুমিল্লার বিখ্যাত লাচ্ছি দিয়ে তৃষ্ণা মেটানো হয়। সবাই দীর্ঘ সময় ধরে বার্ডের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। সন্ধ্যা ৬ঘটিকার সময় পিকনিকের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে গাড়ি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। গাড়ি যখন রাতের আধার ভেদ করে সামনের দিকে ছুটে চলে দুরন্ত গতিতে, সবাই তখন সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে দেয়, অনেককে সিটে বসে ঘুমের রাজ্যে পাড়ি দিতে দেখা যায়। তখনো শেষ আপ্যায়ন বাকী। ঝাল মুড়ি ও একটা সফট ড্রিংকস দিয়ে সেটাও শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ শামশুদ্দীন হেলাল, মজলিস আনসারুল্লাহ চট্টগ্রাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সোহাগীর উদ্যোগে ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২০ জানুয়ারি, ২০২০ লাজনা ইমাইল্লাহ্ সোহাগীর উদ্যোগে ৬ষ্ঠ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরমা মিনারা খাতুন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ সোহাগী। পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন রেহেনা আক্তার এবং দলীয়ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাসিদা পাঠ করেন রেহেনা, বেদেনা, আমেনা ও হালিমা। মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন এস এস রিপা মাহমুদ। তারপর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, নযম, অর্থসহ নামায প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ২টায় যোহর ও আসর নামায পড়ে খাবার পরিবেশন করা হয়। তারপর দ্বীনি মালুমাত, কুইজ এবং খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫টায় সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন প্রথম স্থান অধিকারী হালিমা আক্তার, নযম পেশ করেন রেহেনা ও বেদেনা আক্তার। এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেবা বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ২১ জন, নাসেরাত ১০ জন, শিশু ২ জন ও মেহমান ১ জন, মোট ৩৪ জন উপস্থিত ছিল।

রেহেনা আক্তার, জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। নযম ও মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬০ জন লাজনা, ৯ জন নাসেরাত ও ১৩ জন শিশুসহ মোট ৮২ জন উপস্থিত ছিলেন।

খাওলাদীন উপমা, জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্, সুন্দরবনের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। নযম ও মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত দিবসে লাজনা ১০০ জন, নাসেরাত ১৮ জন ও শিশু ২০ জন সহ মোট ১৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে দোয়া পরিচালনা এবং নাস্তা বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রেশমা তারিক, লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সোহাগীর উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি, ২০২০ দু'দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ সোহাগীর উদ্যোগে তালিম তরবিয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমইল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তরবিয়তী ক্লাসের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত ক্লাসে কেন্দ্র হতে আগত নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী অজুর নিয়ম, গুরুত্ব ও ফযিলত, নামাযের আদব, অর্থসহ নামায, মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা, শুদ্ধ নাযেরা কুরআন ক্লাস, দোয়া, নযম ও দ্বীনি মালুমাত ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন পর্যায়ক্রমে রিপা মাহমুদ, বেদেনা আক্তার, হালিমা আক্তার এবং পর্দার আড়াল থেকে শুদ্ধ কুরআন ও নযম ক্লাস করান মোয়াল্লেম সাহেব। প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে শুরু হয়ে রাত ৯টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। উক্ত ক্লাসে ৭ কিলোমিটার দূর থেকে অংশগ্রহণ করে ছাফিনা কান্দা ও ঘাগড়া পাড়ার ৪ জন নও মোবাঈন। এটি ছিল এই তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। উক্ত ক্লাসে ১৮ জন লাজনা, ১০ জন নাসেরাত, ২ জন শিশুসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন।

রিপা মাহমুদ, সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নরায়ণগঞ্জে স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০১/২০২০ থেকে ২০/০১/২০২০ তিন দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর পক্ষ থেকে স্থানীয় তালিম তরবিয়ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে সকল লাজনা ও নাসেরাত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৭২ জন লাজনা, ১৯ জন নাসেরাত, ১৩ শিশু ও ৭ জন আতফালসহ মোট ১১১ জন অংশগ্রহণ করেন।

খাওলাদীন উপমা, জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে পিকনিক ও পিঠা উৎসব পালিত

গত ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মসজিদ কমপ্লেক্সে পিকনিক ও পিঠা উৎসব শুরু হয় সকাল ১০টা থেকে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা আঞ্জুমানারা রাজ্জাক প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মোহতরমা ফাতেমা দিশা। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। এরপর ৪ হালকা থেকে আগত পিঠা দিয়ে সকালের নাস্তা পরিবেশন করা হয়। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত পিঠা উৎসব হয়। এরপর পিকনিকের কার্যক্রম শুরু হয়। নামায ও খাওয়া দাওয়ার পর নাসেরাতদের খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তারপর লাজনা ও নাসেরাতদের মাঝে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হয়। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে পিকনিক ও পিঠা উৎসব শেষ হয়। উপস্থিতির সংখ্যা লাজনা ২৩ জন, নাসেরাত ৬ জন, শিশু ১ জন, মেহমান ১৪ জন। মোট ৪৪ জন।

আসিয়া জামান নোভা, সহ: জেনারেল সেক্রেটারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে পিকনিক ও পিঠা উৎসব পালিত

গত ৫ মার্চ, ২০২০ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে পিকনিক ও পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পিঠা উৎসবসহ বিভিন্ন ধরনের রান্না করা খাবার প্রদর্শণ করা হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষে জেলা সদর সাহেবার মাধ্যমে লাজনা ও নাসেরাতদের প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। জেলা সদর সাহেবা লাজনা ও নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে তরবিয়তমূলক বক্তৃতা দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিতি যথাক্রমে লাজনা ৬০ জন, নাসেরাত ২১ জন, শিশু ১২ জনসহ মোট ৯৩ জন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রেশমা তারিক, লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের পক্ষ থেকে পিঠা উৎসব ও প্রদর্শনী করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮ জন বোন মোট ১৩ রকম পিঠা প্রদর্শন করেন। সর্বমোট ৫০০০/- টাকার পিঠা বিক্রি হয়। এতে মোট ৩০০/- টাকা নোমায়েশ (প্রদর্শনী) খাতে জমা হয়।

খাওলাদীন উপমা, জেনারেল সেক্রেটারী

করোনা প্রতিরোধে খোদ্দামুল আহমদীয়া, চট্টগ্রামের উদ্যোগে স্টেশনে যাত্রীদের বিনামূল্যে স্প্রে বিতরণ

গত ১৭ মার্চ, ২০২০ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে আগত যাত্রীদেরকে জীবাণুনাশক স্প্রে বিনামূল্যে বিতরণ করার সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেয়। প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলে, যা ২৪ মার্চ পর্যন্ত চলে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্বেচ্ছাসেবক দল চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে আগত এবং স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের যাত্রী ও আগত সকল ব্যক্তিদের হাতে জীবাণুনাশক স্প্রে করেছে। প্রথম দু'দিনে প্রায় চার হাজার পাঁচশ'র বেশি মানুষের হাতে স্প্রে করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিনে গরিবদের মাঝে খাবার বিতরণ

গত ১৭ মার্চ, ২০২০ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যুব সংগঠন মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজধানীর বকশী বাজার এলাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দোয়ার মাধ্যমে গরিব ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মুহাম্মদ জাহেদ আলী, সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) ২৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওমর বিন আব্দাল আজিজ।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাহেরাবাদের প্রবীণ আনসার জনাব ইউনুস আলী মন্ডল গত ২৪/১২/২০১৯ রোজ মঙ্গলবার রাত ৮:৩০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত কারণে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি তাহেরাবাদ মজলিশে আমেলার একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। তিনি আজীবন খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ত সম্পর্ক রেখে ছিলেন। মরহুম নিয়মিত পাঁচ বেলা নামায মসজিদে এসে বাজামা'ত আদায় করতেন। নিয়মিত চাঁদা দিতেন। তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। সৎ নীতিবান তীক্ষ্ণধীশক্তির অধিকারী ছিলেন, মিষ্টিভাষী ও বিনয়ী ছিলেন সেই সাথে তিনি একজন রসিকও মানুষ ছিলেন। বিশেষ করে তার মৃত্যুতে জামা'তের মাঝে বড় শূণ্যতা তৈরি হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই কন্যা ও নাতিনাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুম জানাযা শেষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাহেরাবাদের কবরস্থানে চীরনিদ্রায় শায়িত হন। জামা'তের সকল ভাই বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি, আল্লাহ্ যেন মরহুমের সাথে ক্ষমার আচরণ করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা দেন, আমীন।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী,
তাহেরাবাদ জামা'ত বাঘা, রাজশাহী

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**
২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

New Vol. No. 82 | 18th & 19th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th April, 2020 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

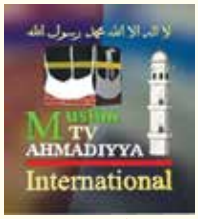

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)-১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)